রবীন্দ্রনাথ

আনুমানিক ৪৫ বৎসর বয়সে

জমিদার রবীন্দ্রনাথ

অমিতাভ চৌধুরী

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

চিত্রসূচী

প্রচ্ছদলিপি : শ্রীখালেদ চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষ চিত্র শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে এবং অন্যান্য চিত্র রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত।

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অশোককুমার সরকারকে—

যিনি আমায় সাংবাদিকতায় এনেছিলেন

সেদিন নদীয়া জেলার বিরাহিমপুর পরগনায় রৌদ্রের উত্তাপ বড়ো প্রবল। পরগনারই একটি গ্রাম খোরশেদপুর। সেই গ্রামেরই কুঠি-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এক চঞ্চল অশ্বারোহী। এদিকে পদ্মানদী, ওদিকে রথতলার মাঠ। মাঠের চার দিকে পাক খেয়ে খেয়ে তিনি ক্লান্ত, গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে জমা স্বেদবিন্দু রৌদ্রের আলোয় চিকচিক করছে। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ধীরগতিতে তিনি আবার ফিরে গেলেন কুঠিবাড়িতে।

অশ্বারোহী বয়সে তরুণ। মাথায় জরির তাজ, গায়ে রঙিন আচকান। সুন্দর সুডৌল চেহারা। যেন যুবরাজ। যুবরাজই বটে, প্রবলপ্রতাপশালী জমিদারের কনিষ্ঠ তনয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে এসেছেন পরগনায় বেড়াতে। বিরাহিমপুর তাঁদেরই জমিদারি। কুঠি-বাড়ির কাছেই সদর কাছারি। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জমিদারির কাজ দেখতে এসেছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ঐ ছোটো ভাইকে। দুজনের বয়সের ব্যবধান বারো বছরের, তবু বন্ধুত্বে বাধা নেই। পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে ছোটো ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সেই প্রথম। উত্তর কলকাতার চিৎপুর পল্লীতে তাঁর বাস। ধনী অভিজাতবংশের সন্তান তিনি। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের খোলা মাঠ নদীর ঘাট সবুজ বন বালির চর এবং পরবর্তী জীবনের বহু সুখদুঃখের সহচরী পদ্মানদীর সঙ্গে তাঁর সখ্য সেই প্রথম শুরু। কোথায় সেই কলকাতার ধূলি-মলিন আকাশ, চিৎপুরের চিৎকার— এখানে এই পদ্মাচুম্বিত জনপদে শুধু আরাম, শুধু আনন্দ, শুধু শান্তি।

চৌদ্দ বছরের ঐ তরুণ অশ্বারোহীকে আবার আমরা দেখি হাতির পিঠে সওয়ার, জঙ্গলের দিকে আগুয়ান। তাঁর গায়ে শিকারের পোশাক, হাতে বন্দুক। আগে আর-একদিন তিনি পরগনারই এক

জঙ্গলে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে বাঘ শিকারে ভীতকম্পিত পদে গিয়েছিলেন। দাদার গুলিতে বাঘ ধরাশায়ী হয়েছিল। এবারও সেই বাঘের আহ্বান। খোরশেদপুর গ্রামের অনতিদূরে তার ডাক শোনা গিয়েছে। সেই বাঘকে ঘায়েল করতেই আবার তরুণের অভিযান। সঙ্গে সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা আর শিকারী বিশ্বনাথ। কিন্তু ঘন বনের মধ্যে ঢুকে হাতি থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। ঝোপের আড়ালে প্রচণ্ড গতিতে যেই লাফ দিয়েছে ঐ হিংস্রতার প্রতিমূর্তি, হাতির পিঠ থেকে তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠল বন্দুক। না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল গুলি, বাঘ পলাতক। অপরূপ সেই দৃশ্য, ঘন সবুজের ফাঁকে দ্রুত অদৃশ্য হল হলুদ রঙের ছোপ। হাতির পিঠে বন্দুক হাতে সেই তরুণ শিকারের কথা ভুলে চলন্ত বাঘের গতিতে মুগ্ধ।

কখনো অশ্বারোহী, কখনো শিকারী এই তরুণকে আবার দেখা গেল নদীর কোলে। জমিদারি দেখাশোনার জন্যে যাতায়াতের যে বিরাট বজরা পদ্মার বুকে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে বাবুমশায়রা এসে থাকেন, সেখান থেকে বৈঠা হাতে বেরিয়ে এলেন তিনি। আঁটসাঁট পোশাক, দেহের অনেকখানি অনাবৃত। হাতের আর পায়ের পেশী দেখলেই অনুমান করা যায়, নিত্য ব্যায়াম এবং হিন্দুস্থানী পালোয়ানদের সঙ্গে ভোরবেলা কুস্তি করার অভ্যাস তাঁর আছে। মাইনে করা মাঝিদের সরিয়ে দিয়ে বৈঠা হাতে তিনি বসলেন ছিপ নৌকায়। তারপর একা বৈঠা চালিয়ে পদ্মানদী করলেন এপার ওপার। হাতের পেশী আর পদ্মার ঢেউ বৈঠার ছন্দে একই সঙ্গে আন্দোলিত হতে লাগল। কুঠিবাড়ি-সংলগ্ন ঘাটে দাঁড়িয়েছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ছাব্বিশ বছরের যুবক চোদ্দ বছরের তরুণকে ধীর শান্ত গলায় হয়তো বললেন—

'আর নয় ; রবি, এবার উঠে এসো।'

'যাই জ্যোতিদাদা।'

দুই ভাই কুঠিবাড়িতে ঢুকে গেলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর

রবীন্দ্রনাথ। ১৮৭৫ সাল। আজ থেকে একশো বছর আগেকার বঙ্গদেশ। ঠিক একশো বছর আগেকার খোরশেদপুর গ্রাম, যার পরিচিত নাম শিলাইদহ।

এই শিলাইদহের নাম রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বহু কীর্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পদ্মা নদী আর এই বিস্তীর্ণ জনপদ রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। তার আগে তিনি পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়েছেন ডালহাউসি পাহাড়, গিয়েছেন বীরভূমের বোলপুর। খুব ছোটোবেলায় আর-একবার তিনি পিতার সঙ্গে এই অঞ্চলেও এসেছিলেন, কিন্তু সে স্মৃতি ঝাপসা। 'ছিন্নপত্রাবলী'র এক চিঠিতে লিখেছেন, 'হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম।' কত সালে কোথাও তার উল্লেখ নেই। তবে সেই আসা বালকের মনে তেমন কোনো ছাপ রাখে নি।

গ্রামীণ পরিবেশে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেওয়ার সুযোগ তিনি পেলেন ১৮৭৫ সালেই সর্বপ্রথম। তার পর দীর্ঘজীবনের বিভিন্ন সময়ে বার বার তিনি এসেছেন এইখানে, এই পল্লীজননীর কোলে। এইখানেই তিনি শুরু করেন বিরাট কর্মযজ্ঞ, যা তাঁর বিপুল সৃষ্টির চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়। বরং আলখাল্লাপরা ঋষিমূর্তির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তাঁর সেই কল্যাণব্রতী কর্মবীরের রূপ। নোবেল পুরস্কারজয়ী বিশ্বকবির অশ্বারোহী বা বন্দুকধারী মূর্তিও কল্পিত কোনো ছবি নয়। আত্মজীবনীমূলক বহু রচনা বা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার উল্লেখ করেছেন। কৈশোরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে পিয়ানো বাজিয়ে সংগীতরচনার ইতিহাসও যেমন আমরা পড়ি, তেমনি এও দেখি ঘোড়ায় চড়া বা হাতির পিঠে বাঘ শিকার করার তালিমও তিনি পেয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তম এই নতুন দাদার কাছে।

এই রবীন্দ্রনাথ অন্য রবীন্দ্রনাথ। যিনি অক্সফোর্ডে 'রিলিজন অফ্

ম্যান' নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, তিনিই পদ্মার চরে আলু চাষে মগ্ন হয়েছেন। যিনি হিজলি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন, তিনিই কুষ্টিয়ায় আখের কল খুলেছেন। যিনি বার্নার্ড শ রমঁ্যা রলাঁর সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করেছেন সত্যসুন্দর নিয়ে, তিনিই কফিলুদ্দিন আহমেদ বা জালালুদ্দিন শেখের সঙ্গে ধান খেতে পোকা মারার পদ্ধতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করেছেন। যিনি শালবীথিতে হাঁটতে হাঁটতে গুনগুন সংগীত রচনায় বা শ্যামলী-র বারান্দায় কবিতা সৃষ্টিতে মগ্ন, কিংবা মন্দিরে উপাসনার আচার্য, তিনিই চাষীদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কৃষিব্যাঙ্ক তৌজি, আদায় তহসিল মামলা-মকদ্দমা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। যিনি গেয়েছেন, 'আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন', তিনিই বলেছেন, 'অন্ন চাই প্রাণ চাই আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু, চাই বল চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু'।

এই অনন্য চরিত্র নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাই আমার বার বার মনে হয়েছে— কবি নয়, সংগীতজ্ঞ নয়, দার্শনিক নয়, যেন একজন হৃদয়বান কর্মযোগী হওয়ার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন, আর সাহিত্য-সংগীত ইত্যাদি জমিদারি পরিচালনার ফাঁকে উপজাত সৃষ্টি। অথচ জমিদার রবীন্দ্রনাথ -শীর্ষক রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ করাও দুরূহ ব্যাপার। শিলাইদহ, পতিসর বা সাজাদপুরে রাখা কোনো কাগজপত্রই অবশিষ্ট নেই, সব লুপ্ত। অল্প যা-কিছু আছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে, তাও প্রধানত জোড়াসাঁকো বাড়ির বা শান্তিনিকেতনের কাছারির হিসাব। অবলম্বনের মধ্যে প্রধান হল বিভিন্ন সময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, কিছু গদ্য রচনা, আর নানা জনের সাক্ষ্য। পল্লীপ্রকৃতি, কালান্তর, সমবায়নীতি, আত্মশক্তি ও সমূহ, রাশিয়ার চিঠি ইত্যাদি পড়লে গ্রাম ও নিজের জমিদারি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব অনেকটা বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়ের নাম। তিনি শিলাই-

দহের একদা-অধিবাসী, দীর্ঘদিন ঠাকুর-এস্টেটের কর্মচারী, রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে ধন্য। তিনি জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক তথ্য তাঁর লেখা নানা বইয়ে আমাদের উপহার দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে অনেক ব্যাপারে ঋণী। আর ঋণী বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনের কাছে। তবে জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ও হুকুমের ফাইল খোঁজ করেও আমি পাই নি। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের দাবি আমলে জমিদারির স্বার্থের প্রতিকূল হবে ভেবে নদীয়ার কালেক্টার সব নথি পুড়িয়ে ফেলেন। পাকিস্তান হওয়ার পর পতিসরের কাগজপত্রও বিনষ্ট।

আর-একটি ব্যাপার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। রবীন্দ্র-সাহিত্য এই রচনার সঙ্গে আমি মিশিয়ে দিই নি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক-পরিচয় এখানে উহ্য, জমিদারি পরিচালনা করতে করতে কী কী লিখেছেন বা পদ্মানদী ও সাজাদপুর তাঁকে কী প্রেরণা দিয়েছে, তার কোনো ব্যাখ্যা দিই নি বা বর্ণনা করি নি। সে তো অনেকেরই জানা এবং আমার আলোচনার ক্ষেত্রও তা নয়, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কবি নয়, কর্মী রবীন্দ্রনাথ।

এই প্রসঙ্গে একটি জিনিস লক্ষণীয়। বেশ কিছু বাঙালি বিশ্বাস করেন এবং সাড়ম্বরে প্রচার করেন, রবীন্দ্রনাথ নাকি জমিদার হিসাবে অত্যাচারী ছিলেন, প্রজাদের ভাতে মেরে নিজের পরিবারের ভাণ্ডার ভরাট করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জমিদারি এলাকায় বসবাসকারী বহু লোকও এই মতে আস্থাবান। তাঁদের বেশির ভাগই হিন্দু। কিন্তু ঠাকুর-এস্টেটের মুসলমান প্রজাদের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন।

রবীন্দ্রনাথকে অত্যাচারী প্রজাপীড়ক বলে চিহ্নিত করার মূলে অবশ্য আছে সেই চিরাচরিত রবীন্দ্রবিদ্বেষ। রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্যে সংগীতে বা দর্শনচিন্তায় লোকোত্তর প্রতিভা, এই কথাটা দেশে বিদেশে বার বার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনিন্দকদের শেষ ভরসা-স্থল তাঁর জমিদারতনয়ের ভূমিকা। কিন্তু সে অপবাদ যে কত মিথ্যা,

কত অসার তার প্রমাণ যিনি তাঁর চিঠিপত্র ও রচনা নাড়াচাড়া করবেন, তিনিই পাবেন।

ওই রবীন্দ্রনিন্দকদের একদল কুৎসা রটনা করেন অজ্ঞতা থেকে, অন্যদলের কারণ সংগত। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিচালনা করতে গিয়ে কায়েমী স্বার্থের যে কটি দুর্গে কামান দেগেছিলেন, তার সব ক'টিরই রক্ষক ছিলেন হয় হিন্দু গোমস্তা, নয় হিন্দু মহাজন বা জোতদার। তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্রবিদ্বেষ অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই প্রথম তাঁরা রবীন্দ্রনাথের জেদ আর কল্যাণব্রতের সামনে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করেছিলেন। আর যেহেতু ঠাকুর-এস্টেটের অধিকাংশ প্রজাই ছিলেন মুসলমান, তাই সবরকম কল্যাণকর্মে সর্বাধিক উপকৃত হয়েছিলেন ঐ মুসলমান প্রজারাই। তাঁদের রবীন্দ্রভক্তি ঐ কারণেই। কিন্তু কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী লোক সাধারণ গ্রামীণ অর্থনীতির কথা ভুলে গিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি টেনে এনেছেন জমিদারিতে। এমনও বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম কিনা, তাই এত মুসলমান-প্রীতি। সেই মিথ্যাপ্রচার সঞ্চারিত হয়েছে কলকাতার কিছু-না-জেনেও-সবজান্তা বিশ্বনিন্দকদের বৈঠকখানায় ও মজলিসে।

তথ্য কিন্তু অন্য কথা বলে। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ধারণা জন্ম নেওয়ার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে প্রজামঙ্গলে বিপ্লব ঘটিয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে এমন অনেক নিয়মের প্রবর্তন করেছিলেন, যা আজও অনেক সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না। অথচ কী দুর্ভাগ্য রবীন্দ্রনাথের, স্বদেশবাসীর কাছে বিলাসব্যসনে মগ্ন মৃণালভুক একজন জমিদার-তনয়ের পরিচয় নিয়েই তাঁকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

জমিদার রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দেওয়ার আগে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির জমিদারির পরিচয় দেওয়া দরকার। যশোহরের পিরালী ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম কুশারীর বংশধর পঞ্চানন ইংরেজ আমলের শুরুতে কলকাতায় এসে পেলেন 'ঠাকুর' পদবী। পঞ্চাননের পৌত্র ও জয়রামের পুত্র নীলমণি ঠাকুর ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্য করে হলেন বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক। পাথুরিয়াঘাটা ছেড়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পত্তন করেন এই নীলমণিই। বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছ থেকে জমি কিনে তৈরি করেন বিরাট প্রাসাদ— এখন যেটা ছয় নম্বর বাড়ি, রবীন্দ্রভারতীর সম্পত্তি। এই নীলমণির পৌত্র, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ— যাঁর প্রখর ব্যাবসাবুদ্ধি ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুররা হলেন সেকালের সবচেয়ে ক্ষমতাবান, সবচেয়ে ধনবান পরিবার। পাঁচ নম্বর বাড়ি— যেখানে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথরা থাকতেন— তৈরি করেন দ্বারকানাথ। সেটা ছিল তাঁর বৈঠকখানা-বাড়ি। সে বাড়ির চিহ্ন আজ আর নেই। পূর্ববঙ্গ আর ওড়িশায় বিশাল জমিদারি খরিদ করেন এই দ্বারকানাথ। তার আগে নীলমণি কিছু জমি খরিদ করেন ওড়িশায় এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলোচনও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কিছু ভূসম্পত্তি কেনেন। জ্যেষ্ঠ রামলোচনের পালিত পুত্র দ্বারকানাথ তাঁর মধ্যম-ভ্রাতা রামমণির দ্বিতীয় সন্তান। রামলোচন ও দ্বারকানাথের আমলে যে-সব এলাকা ঠাকুর এস্টেটের অধীনে আসে, তার মধ্যে আছে নদীয়া (বর্তমানে কুষ্টিয়া) জেলার বিরাহিমপুর পরগনা (সদর শিলাইদহ), পাবনা জেলার সাজাদপুর পরগনা (সদর সাজাদপুর), রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগনা (সদর পতিসর) এবং ওড়িশার কটক জেলার পাণ্ডুয়া বালিয়া প্রহরাজপুর শরগড়া ইত্যাদি তৌজির জমিদারি। তা ছাড়া ছিল নুরনগর পরগনা, হুগলির মৌজা আয়মা হরিপুর, (মণ্ডলঘাট) পাবনার পত্তনী তালুক তরফ চাপড়ি, রংপুরে

স্বরূপপুর, যশোরে মহম্মদশাহী ইত্যাদি এলাকা। মেদিনীপুর ও *ত্রিপুরা রাজ্যের কমলপুর* মহকুমায় কিছু জমিদারি দ্বারকানাথ খরিদ করেছিলেন বলে জানা যায়। এই সম্পর্কে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

"আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে [৯ জানুয়ারি ১৮৪২] য়ুরোপে প্রথম যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী পাবনা রাজশাহী কটক মেদিনীপুর রঙ্গপুর ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী এবং নীলের কুঠি, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন-সময়। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। আমাদের হাতে পড়িয়া যদি বাণিজ্য-ব্যবসায়-কার্য্যের পতন হয়, তবে স্বোপার্জ্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী আছে তাহাও তাহার সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, এবং পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারীও থাকিবে না। তাঁহার বাণিজ্য-ব্যাপারের ক্ষতিতে আমরা যে পূর্ব্বপুরুষদিগের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটি তাঁহার মনে অতিশয় চিন্তার বিষয় ছিল। অতএব য়ুরোপে যাইবার পূর্ব্বে, ১৭৬২ শকে [১৮৪০ সালের ২০ আগস্ট], আমাদের পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারীর সঙ্গে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগণা কালীগ্রাম একত্র করিয়া, এই চারিটি সম্পত্তির উপরে একটি ট্রষ্ট-ডীড্ লিখিয়া, তিনজন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সমস্তের অধিকারী তাঁহারাই হইলেন ; আমরা কেবল তাহার উপস্বত্ব-ভোগী রহিলাম। তাঁহার এই কার্য্যে আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।"

এই বিবরণেই প্রমাণ রামলোচন জমিদারির গোড়াপত্তন করলেও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন দ্বারকানাথ। এবং এও জানা গেল শিলাইদহ

অঞ্চলের জমিদারি দ্বারকানাথের আগেই খরিদ করা হয়। তবে পরে প্রধানত বিরাহিমপুর, কালীগ্রাম, সাজাদপুর ও কটকের জমিদারি ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের জমিদারি কী ভাবে কখন হাতছাড়া হল, তার বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। বিশেষ করে ত্রিপুরা ও মেদিনীপুরের জমিদারির কোনো উল্লেখ নেই। শুধু শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রাখা ১৮৬৪ সালে দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি হিসাবের খাতাতে দেখা যায়, মহর্ষি নিজে মেদিনীপুর গিয়েছেন। জমিদারি দেখতে, না রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেখা করতে, তার কোনো উল্লেখ অবশ্য ঐ খাতাতে নেই।

রবীন্দ্রসদনে ঠাকুর-এস্টেটের জমিদারির কিছু খাতাপত্র আছে। তাতে ১২৯১ বঙ্গাব্দের অর্থাৎ ১৮৯৪ সালের একটি জমাখরচের খাতায় আদায়ের হিসাব পাওয়া যায়। এই আদায় ধান বিক্রির নয়, চাষীদের কাছ থেকে খাজনা স্বরূপ।—

১.	পরগণে বিরাহিমপুর	জমা	৫২,৮৫৭৲
২.	ডিহি সাহাজাদপুর	জমা	৭৮,৩৩৮।৪॥
৩.	পরগণা কালীগ্রাম	জমা	৫০,৪২০।/০
৪.	তালুক পাণ্ডুয়া	জমা	১৫,৮৪৫৲
৫.	তালুক বালিয়া	জমা	৫,৫০০৲
৬.	কিসামত সদকী	জমা	৪৩১৲
৭	মৌজে বিরাটগ্রাম	জমা	২৩৫৲
			২,৩২,৯৪৯॥/০
	গতবর্ষের বাকি		১৩২৫৸৶•
			২,৩৪,২৭৫॥
	মোট খরচ		২,২৯,৬৫১৶৯

এ ছাড়া আরো কয়েকটি সম্পত্তির খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ঐ জমাখরচের হিসাব মারফত। ১২৮৬ সালের এক জমাখরচের খাতায় উপরের ঐ সাতটি ছাড়া আরো আছে— ৮. পরগনা মুরনগর

৯. নদীয়া জেলার বাজার সেরকান্দি মৌজা, ১০. হুগলি জেলার মৌজে আয়মা হরিপুর, ১১. পাবনার পত্তনীতালুক তরফ্ চাপড়ির উল্লেখ। আর-একটি হিসাবে আছে— ১২. নদীয়া জেলার খোবড়াকোল পীরপুর ইত্যাদি চরজমিদারি। তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত উপরোক্ত তালিকার ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ দফা জমিদারি ভালোভাবেই টিঁকে ছিল। ৬নং ও ৯নং দফা বিরাহিমপুরের শামিল, ৭নং দফা সাজাদপুরের অন্তর্গত, ১০নং দফা চুঁচুড়ার একজন ভদ্রলোক দেখাশোনা করতেন, ৮নং ও ৯নং দফা সম্ভবত বিক্রি হয়ে যায় এবং ১২নং দফা ১৯২১ সালে হস্তান্তরিত হয় ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর নামে।

দ্বারকানাথের পর দেবেন্দ্রনাথের আমল। দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি শুধু নন, রাজর্ষিও। তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মে মতি, বিষয়-বৈরাগ্য তাঁর ছিল, তবে তার সঙ্গে ছিল পরিবার-প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যবোধ। তাঁর আমলে জমিদারির প্রসার ঘটে নি বটে, কিন্তু ভূসম্পত্তির পরিচালনা সুসংহত হয়েছে। গোড়ায় তিনি নিজেই সব দেখাশোনা করতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের অংশেরও দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। পরে বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের ভাগ-বাটোয়ারা তিনি নিজেই করে দেন। মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে পাবনার সাজাদপুর পরগনা। কিন্তু গিরীন্দ্রনাথের পর তাঁর দুই পুত্র গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ অকালে মারা গেলে গণেন্দ্রনাথের তিন পুত্র গগনেন্দ্রনাথ সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সম্পত্তি দেখাশোনার ভার নিজে নিয়ে সব প্রাপ্য টাকা তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন। গণেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান অবস্থায় অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় তাঁর স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর আজীবন ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দেন মাসিক এক হাজার টাকা দেবার নির্দেশ দিয়ে।

সদর শিলাইদহসমেত বিরাহিমপুর পরগনার আদি ইতিহাস সঠিক পাওয়া যায় না। তবে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়

মহর্ষির আমলের বাকি খাজনার আরজির জবানিতে। আরজির নকল হচ্ছে এই রকম : "জেলা নদীয়া কালেক্টরীর তৌজীর ৩৪৩০ নং মহাল পরগণা বিরাহিমপুর বাদীর স্বগায় পিতা ৺বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারী। বাদীর পিতার পরলোকান্তে ঐ সম্পত্তি ও ত্যক্ত এষ্টেটের অন্যান্য সম্পত্তি বাদীর পিতার ১৮৪০ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখের ডিড্ অব সেটেলমেন্ট নামক দলিলের সর্ত্তানুসারে ও উক্ত এষ্টেটের স্বার্থভোগী বাদী ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের নিয়োগমতে ট্রাষ্টী পরম্পরায় ও পরিশেষে কথিতরূপ ট্রাষ্টসূত্রে বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ও বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ট্রাষ্টীত্রয়ের তত্ত্বাবধানে থাকনাবস্থায় গত ১৮৯৭ সালে বাদী ও শেষোক্ত ট্রাষ্টী ও অন্যান্যের মধ্যে কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টের অরিজিন্যাল বিভাগে ৫৮৫ নম্বরে পার্টিসান সুট উপস্থিত হইয়া ঐ মোকর্দ্দমায় পক্ষগণের সোলেনামা সূত্রে যে ডিক্রী হয় তদনুসারে ট্রাষ্টীগণের ট্রাষ্টস্বত্ব ১৩০৫ সালের সুরু হইতে লোপ পাইয়া অন্যান্য জমিদারীসহ উল্লিখিত পরগণে বিরাহিমপুর ষোলআনা রকম ও তৎ সংক্রান্ত সর্ব-প্রকার পাওনা বাদী নিজাংশে প্রাপ্ত হইয়া জমিদারিরস্বত্বে কালেক্টরীতে নামজারী পূর্বক সদর মফঃস্বল কর আদায়ে স্বত্ববান্ ও দখলীকার আছেন ও কথিত সোলেনামামত শেষ ট্রাষ্টীত্রয়ের দখলীসময়ের বাকী বকেয়া খাজনা আদায় করিয়া লইবার স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন।..."

এই আরজিতেই আন্দাজ করা যায় যে, নানারকম আইনঘটিত ক্রিয়ায় বিরাহিমপুরের জমিদারি দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঋণশোধের ব্যাপারে ঐরকম দাঁড়িয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ শেষ উইল করেন ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর। সেই উইল-মতো ওড়িশার সম্পত্তি পান তাঁর তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ, এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ তিনজনে মিলে একত্রে পেলেন নদীয়ার বিরাহিমপুর ও রাজশাহীর কালীগ্রাম। কনিষ্ঠভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর জন্য মাসিক বরাদ্দ হয় ১০০০

টাকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিঃসন্তান, তাই তাঁর জন্যে মাসহারা ১২৫০ টাকা। সোমেন্দ্রনাথ বায়ুরোগগ্রস্ত, তিনি পেলেন মাসে ২০০ টাকা। বীরেন্দ্রনাথও উন্মাদ, তার জন্যে বরাদ্দ মাসিক ১০০ টাকা, তাঁর স্ত্রী প্রফুল্লময়ী দেবীর জন্য ১০০ টাকা এবং বীরেন্দ্রনাথের পুত্রবধূ ও বলেন্দ্র-নাথের স্ত্রী সাহানা দেবীর জন্যে ১০০ টাকা। এই টাকা হাতখরচের জন্যে দেওয়া। দেবেন্দ্রনাথের অন্য দুই পুত্র— পুণ্যেন্দ্রনাথ ও বুধেন্দ্রনাথ শৈশবেই মারা যান। সুতরাং মাসিক ভাতার প্রশ্ন ওঠে না। তা ছাড়া তাঁর কন্যাদের মধ্যে জীবিতকাল পর্যন্ত মাসিক বৃত্তির পরিমাণ ছিল— সৌদামিনী দেবী ২৫ টাকা, শরৎকুমারী দেবী ২০০ টাকা, স্বর্ণকুমারী দেবী ৮৭॥ এবং বর্ণকুমারী দেবী ৮৭॥। শেষোক্ত দুই ক্ষেত্রে টাকা বেড়ে পরে হয় মাসিক ১০০ টাকা। অন্য কন্যা সুকুমারী দেবী অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় তাঁর জন্যে বৃত্তি বরাদ্দ হয় নি। সৌদামিনী দেবী পিতৃগৃহেই থাকতেন। তাঁর স্বামী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ও পেতেন মাসহারা ৫০ টাকা। এই ব্যক্তি-বৃত্তি ছাড়াও জমিদারির আয় থেকে প্রতি মাসে দেওয়া হত আদি ব্রাহ্ম-সমাজকে ২০০ টাকা, শান্তিনিকেতন ট্রাস্টকে ৩০০ টাকা এবং দেবসেবার জন্য সেবায়েৎ বার্ষিক ২০০০ টাকা। এ ছাড়া আদরের বড়ো নাতি হিসাবে জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ পেতেন মাসে ৫০০ টাকা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বার্ষিক ৫২,৪০০ টাকা।

এই টাকার জন্যে দায়বদ্ধ রইলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। তা ছাড়া ১৯১২ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ৯৯ বছরের ইজারা পাট্টা দেন তাঁর নিজস্ব এক-তৃতীয়াংশ সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে। জমিদারিতে লাভ হোক আর লোকসান হোক, প্রতি বছর দ্বিজেন্দ্র-নাথকে ৪৫ হাজার টাকা করে দেবার জন্যে দায়ী থাকেন সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ কিংবা তাঁদের ওয়ারিশগণ। তার মধ্যে শেষ পর্যন্ত একা রবীন্দ্রনাথই কার্যত দায়ী রইলেন এতগুলো টাকার জন্যে (মোট ৯৭,৪০০ টাকা)। কেননা, সত্যেন্দ্রনাথ সিবিল সারভিসের লোক,

চাকরি নিয়ে বরাবর বাংলাদেশের বাইরে। ঐ প্রায় লাখ টাকার দায় ছাড়াও রয়েছে পারিবারিক ব্যয়, জোড়াসাঁকো বাড়ির ব্যয়, জমিদারি পরিচালনার ব্যয়। এ বাবদ টাকার পরিমাণও কম নয়।— বছরে অন্তত আরো লাখ দুই তিন টাকা।

ঠাকুরবাবুরা সরকারকে সদর খাজনা কত দিতেন? কিছু তথ্য আছে দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি খাতায়। তাতে দেখা যাচ্ছে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে একমাত্র বিরাহিমপুর পরগনার সদর খাজনা ১৬,৯০২ টাকা। এই হিসাবমতো বাংলাদেশের তিনটি পরগনা বাবদ সদরখাজনা অন্তত ৫০,০০০ টাকা। সেইসঙ্গে আছে ওড়িশার জমিদারির খাজনাও।

দেবেন্দ্রনাথ যখন প্রত্যক্ষভাবে জমিদারি দেখাশোনা ছেড়ে দিলেন তখন তাঁর প্রতিভূ হয়ে কাজ করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, বড়ো জামাই সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথের বড়ো ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথ ও মেজো ছেলে অরুণেন্দ্রনাথ, সারদাপ্রসাদের ছেলে সত্যপ্রসাদ এবং সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ। সামগ্রিক দায়িত্ব দিয়ে কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে কেন দেবেন্দ্রনাথ নির্বাচন করেছিলেন তা স্পষ্ট জানা যায় না। তবে বরাবরই এই সন্তানটির প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা। এমন কথাও শোনা যায় যে, ঠাকুর-এস্টেটের আমলাদের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ, নানারকম অসন্তোষ জমা হচ্ছিল প্রজাদের পক্ষ থেকে এবং জমিদারিসংলগ্ন কুমারখালির মনীষী হরিনাথ মজুমদারের (কাঙাল হরিনাথ) কাগজ 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় সেই-সব অসন্তোষের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল। হয়তো দেবেন্দ্রনাথ এই অসন্তোষের প্রতিবিধান করতেই প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্রকে জমিদারি পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যে হরিনাথ মজুমদারের কাগজের গ্রাহক ছিলেন, তার প্রমাণ আছে। আছে, রবীন্দ্রসদনে রাখা দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব হিসাব-বহিতে।

রবীন্দ্রনাথ যখন দায়িত্বভার পেলেন, তখন তাঁর বয়স ত্রিশের নীচে। মাসহারার ঐ ৯৭ হাজার ৪ শত টাকার দায়িত্ব তো ঘাড়ে

রইলই; তা ছাড়া দেখাশোনার ভার নিলেন আরো দুটি জমিদারির। একেবারে প্রথম দিকে সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের অংশ ওড়িশার ও গুণেন্দ্রনাথের অংশ সাজাদপুরের জমিদারি পরিচালনা করে তার হিসাবপত্র লাভালাভ প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দেবার দায়িত্বও রইল রবীন্দ্রনাথের উপর। পরে ঐ দুটি জমিদারিই সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই বিরাট এজমালি সম্পত্তির সর্বময় কর্তৃত্ব প্রথমে পান নি। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। তাই তিনি গোড়ায় পান ইন্সপেকশনের ভার— ১৮৯০ সালে। তার পর রবীন্দ্রনাথের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ১৮৯৬ খৃস্টাব্দের ৮ আগস্ট পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে সমগ্র সম্পত্তির সর্বময় কর্তৃত্ব দেবেন্দ্রনাথ ছেড়ে দেন রবীন্দ্রনাথের উপর। সেই সময় রবীন্দ্রনাথকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রণিধানযোগ্য (দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ২৯৬)। পিতা পুত্রকে লিখছেন :

"এইক্ষণে তুমি জমিদারীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও ; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমা ওয়াশিল বাকী ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্র সকল দেখিয়া তার সারমর্ম্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতিসপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্ত-মতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্য্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য্য করিবার ভার অর্পণ করিব।"

রবীন্দ্রনাথ স্কুলে কোনো পরীক্ষায় পাস করেন নি, ব্যারিস্টারিতেও নয়, কিন্তু পিতার কাছে এই কঠিন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পুত্রের বিচক্ষণতায় পিতার 'প্রতীতি' হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথ পুরো পাঁচ বছর শিক্ষানবিশী করে 'মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য্য করিবার' ভারপ্রাপ্ত হন। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নানা জায়গায়

লিখেছেন ও বলেছেন, এই শিক্ষানবিশীকালে পিতার কাছে হিসাবের পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর কী রকম দুশ্চিন্তা হত, কী ভাবে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তথ্য মহর্ষি বুঝে নিতেন, এক কানাকড়িও এদিক সেদিক হবার উপায় ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য জমিদারির পুরো ভার পেয়ে চিরাচরিতপ্রথা সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। তার আগে তাঁর দাদারা ভাইপো ভাগনে, ভগ্নিপতি এসেছেন একই দায়িত্ব নিয়ে, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সাধারণ জমিদার-মাত্র, প্রথার দাস। তারও আগে এসেছেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ। তিন-চারবার। তিনি বেশির ভাগ বোটেই থাকতেন, বোটেই যাতায়াত করতেন। জমিদারি পরিচালনা ছাড়াও ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। পাবনা, কুষ্টিয়া ও কুমারখালিতে তিনি তিনটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। পিতামহ দ্বারকানাথও জমিদারিতে গিয়েছেন। তবে তাঁর আমলে পরিচালনার ভার ছিল প্রধানত সাহেব ম্যানেজারদের উপর। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই ব্যাপারেও হলেন ব্যতিক্রম। পূর্বসূরীদের সোজা রাস্তা ছেড়ে এগোলেন কঠিন রাস্তায়। সেই রাস্তা অতিক্রম করতে তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে বটে, তবে কখনো হতোদ্যম হন নি, আপন লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছেন।

বিরাট এজমালি সম্পত্তি কয়েক বছর রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে পরিচালনা করেন। তার পর আগেই বলেছি, ওড়িশার ভূসম্পত্তির পূর্ণ মালিকানা চলে যায় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাবালক বংশধরদের হাতে। তার পর সাজাদপুর পরগনা গেল গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রদের দখলে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের রইল শুধু বিরাহিমপুর ও কালীগ্রাম পরগনা।

পরবর্তীকালে হল আবার ভাগ। শিলাইদহ সমেত বিরাহিমপুর পরগনা গেল সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অংশে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সুরেন ঠাকুরকে বলেছিলেন বিরাহিমপুর ও

কালীগ্রাম পরগনার মধ্যে যে-কোনো একটি বেছে নিতে। সুরেন ঠাকুর বিরাহিমপুর পছন্দ করেন। রবীন্দ্রনাথের রইল শুধু রাজশাহীর কালীগ্রাম পরগনা— যার সদর পতিসর। তবে ঐ দুটি পরগনার মালিকানায় দ্বিজেন্দ্রনাথ বা তাঁর ওয়ারিশনদেরও অংশ ছিল। সুরেন ঠাকুরের আমলে শিলাইদহ ঋণের দায়ে বন্ধক হিসাবে চলে যায় ভাগ্যকুলের কুণ্ডুদের হাতে। এই দেনা কোনোদিনই শোধ হয় নি, ওয়ার্ড এস্টেট, রিসিভার এস্টেট ইত্যাদির খোলস পরেও বিরাহিম-পুর আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়। অবশেষে ভাগ্যকুলের কুণ্ডুরাই হলেন শিলাইদহের মালিক। রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থাতেই শেষদিকে কালীগ্রাম পরগনা দেখাশোনার দায়িত্ব নেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার আগে দুই জমিদারির ম্যানেজিং এজেন্ট রূপে কিছুদিন কাজ করেন প্রমথ চৌধুরী। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ। ১৯৫২ সালের এক অরডিন্যান্সবলে শিলাইদহ তো গেলই, কালীগ্রাম পরগনাও গেল পূর্ব পাকিস্তান সরকারের হাতে। তার পর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। রাজনৈতিক কত উত্থানপতন। শিলাইদহের কুঠিবাড়িটি শুধু সংরক্ষিত গৃহ হিসাবে বিশেষ মর্যাদা পেল। অর্থাৎ ছয় পুরুষের ঠাকুর-জমিদারির এইখানেই ইতি।

৩

রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পরিচালনার বিশদ বিবরণ দেবার আগে বাংলাদেশের গ্রাম, প্রজা-জমিদার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কী চিন্তা করতেন জানা দরকার। সেই চিন্তাভাবনা অবশ্য কল্পিত কিছু নয়, তাঁর সমস্ত ধ্যানধারণাকে তিনিই একমাত্র বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন। গ্রাম-বাংলার এই রূপকারের পরিচয় খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত-ভাবে আমরা জানি, শুধু জানি না, কী পরিমাণ অন্তর্দৃষ্টি, উদ্যম ও স্বচ্ছচিন্তা নিয়ে তিনি কাজে হাত দিয়েছিলেন। 'ফিরে চল্ মাটির টানে' বাক্যটি শুধুমাত্র গান নয়, কর্মী রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা।

কুঠিবা

দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে।"

রবীন্দ্রনাথ এইসঙ্গে লক্ষ করেছিলেন, দেশের নেতা ও গুণী-জ্ঞানীদের গ্রামের প্রতি অবজ্ঞা। সমাজভেদ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বড়ো দুঃখে লিখেছেন, "পল্লীসমাজের পঞ্চায়েত-প্রথা গবর্মেন্টের চাপরাশ গলায় বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিয়া ভূত হইয়া পল্লীর বুকে চাপিতেছে; দেশের অন্নে টোলের আর পেট ভরিতেছে না; দুর্ভিক্ষের দায়ে একে একে তাহারা সরকারি অন্নসত্রের শরণাপন্ন হইতেছে; দেশের ধনী-মানীরা জন্মস্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতায় মোটরগাড়ি চড়িয়া ফিরিতেছে।"

নিজে জমিদার হয়েও দেশের উন্নতিতে পরাঙ্মুখ জমিদারবর্গকে উদ্দেশ করে পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ বলেন—"তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়ত-দিগকে পরের হাত ও নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভালো আইন বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার মহাজন পুলিস কানুনগো আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সে অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে, তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কী করিয়া?"

১৩০৫ সালের 'ভারতী' পত্রিকায় 'মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে' (উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখার্জি ও জননেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মধ্যে বাদানুবাদের জবাবে) নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরো লেখেন, "এদেশে পূর্বকালে জমিদার সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল, তাহা খেতাব অবলম্বনে ছিল না, তাহা দান অর্চনা কীর্তিস্থাপন আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্প-সাহিত্যের পালন-

পোষণের উপর নির্ভর করিত, সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদাররা প্রতিদিন হারাইতেছেন।"

এই শ্রেণীর জমিদারদের মূর্ত প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ নিজে। তিনি নিজে ধনকামী জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও বলতে পেরেছিলেন— "ধনের ধর্ম অসাম্য। ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।"

হিতসাধন মণ্ডলীর সভায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, তা আজও 'সত্য হয়ে' আছে—"শিক্ষিত লোকের মনে অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রতি একটা অস্থিমজ্জাগত অবজ্ঞা আছে। যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর গ্রামবাসীদের সংসর্গ করা তাদের পক্ষে কঠিন। আমরা ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকদের সমস্ত দাবি আমরা নীচের লোকদের কাছ থেকে আদায় করব, এ কথা আমরা ভুলতে পারি নে। আমরা তাদের হিত করতে এসেছি, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান ক'রে এক মুহূর্তে আমাদের পদানত হবে, আমরা যা বলব তাই মাথায় করে নেবে, এ আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু ঘটে উলটো। গ্রামের চাষীরা ভদ্রলোকদের বিশ্বাস করে না। তারা তাদের আবির্ভাবকে উৎপাত এবং তাদের মতলবকে মন্দ বলে গোড়াতেই ধরে নেয়। দোষ দেওয়া যায় না, কারণ, যারা উপরে থাকে তারা অকারণে উপকার করবার জন্যে নীচে নেমে আসে এমন ঘটনা তারা সর্বদা দেখে না— উলটোটাই দেখতে পায়। তাই, যাদের বুদ্ধি কম তারা বুদ্ধিমানকে ভয় করে। গোড়াকার এই অবিশ্বাসকে এই বাধাকে নম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে যারা কাজ করতে পারে, তারাই এ কাজের যোগ্য।"

গ্রাম সম্পর্কে, অচেতন নগরবাসী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আর-একটি উক্তি (শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্‌বোধনে ১৯৩৮ সালের ভাষণ) এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় : "কর্ম উপলক্ষে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে

পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কিরকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা-চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেন নি যে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।"

অথচ মূলত নাগরিক হয়েও রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। তিনি পল্লী-জীবন প্রত্যক্ষ করেছেন পল্লীতে বাস করে। ১৩৪৬ সালে শ্রীনিকেতনে কর্মীদের এক সভায় বলেন: "প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখদুঃখ নালিশ আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। একদিকে বাইরের ছবি— নদী, প্রান্তর, ধানখেত, ছায়াতরুতলে তাদের কুটির, আর-একদিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত।"

রবীন্দ্রনাথের মতে: "গ্রামের কাজের দুটো দিক আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হলে শিক্ষালাভ করা চাই।"

প্রকৃত ভারতবর্ষকে পাওয়ার জন্যে তাই তিনি পরে কর্মীদের বলেন: "আমি যদি কেবল দুটি তিনটি গ্রামকেও মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতবর্ষের একটি ছোটো আদর্শ তৈরি হবে— এই কথা তখন মনে জেগেছিল, এখনো সেই কথা মনে হচ্ছে। এই কখানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে— সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গান-বাজনা কীর্তন-পাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল কখানা গ্রামকে এইভাবে তৈরি করে দাও। আমি

বলব, এই কখানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তা হলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।"

রাশিয়ার চিঠিতে তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন জমিদারি পরিচালনার সময় কী ছিল তাঁর অভিপ্রায়: "চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে ছুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে— জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর। দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসিতে জল আনা একই কথা।"

১৯২৬ সালে ময়মনসিংহে এক অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন: "কেন তৃষ্ণার্তের কান্না গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত আকাশ ভেদ করে ওঠে? কেন এত ক্ষুধা, অজ্ঞানতা, মারী। সমস্ত দেশের স্বাভাবিক প্রাণচেষ্টার গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। যেমন আমরা দেখতে পাই, যেখানে নদী-স্রোতের প্রবাহ ছিল সেখানে নদী যদি শুষ্ক হয়ে যায় বা স্রোত অন্য দিকে চলে যায় তবে ছুকূল মারীতে ছুর্ভিক্ষে পীড়িত হয়ে পড়ে। তেমনি এক সময়ে পল্লীর হৃদয়ে যে প্রাণশক্তি অজস্র ধারায় শাখায় প্রশাখায় প্রবাহিত হত আজ তা নির্জীব হয়ে গেছে, এইজন্যেই ফসল ফলছে না। দেশ-বিদেশের অতিথিরা ফিরে যাচ্ছেন আমাদের দৈন্যকে উপহাস করে। চার দিকে এইজন্যেই বিভীষিকা দেখছি। যদি সেদিন না ফেরাতে পারি, তবে শহরের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে, নানা অনুষ্ঠান করে কিছু ফল হবে না। প্রাণের ক্ষেত্র যেখানে, জাতি যেখানে জন্মলাভ করেছে, সমাজের ব্যবস্থা হয় যেখানে, সেই পল্লীর প্রাণকে প্রকাশিত করো— তা হলেই আমি বিশ্বাস করি সমস্ত সমস্যা দূর হবে।…পল্লীপ্রাণের বিচিত্র অভাব দূর করবার জন্য যারা ব্রতী তাদের পাশে আপনাদের আহ্বান করছি। তাদের একলা ফেলে রাখবেন না, অসহায় করে রাখবেন না, তাদের আনুকূল্য করুন।

কেবল বাক্য রচনায় আপনাদের শক্তি নিঃশেষিত হলে, আমাকে যতই প্রশংসা করুন, বরমাল্য দিন, তাতে উপযুক্ত প্রত্যর্পণ হবে না। আমি দেশের জন্যে আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাই। শুধু মুখের কথায় আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। আমি চাই ত্যাগের ভিক্ষা, তা যদি না দিতে পারেন তবে জীবন ব্যর্থ হবে, দেশ সার্থকতা লাভ করতে পারবে না, আপনাদের উত্তেজনা যতই বড়ো হোক-না কেন।"

তবুও 'ধনীর সন্তান' বলে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কত কটাক্ষ! তাই বড়ো দুঃখের সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন: "লোকে অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে সমালোচনা করে ঘরগড়া মত নিয়ে। বলে, 'উনি তো ধনী-ঘরের ছেলে। ইংরেজিতে যাকে বলে, রুপোর চামচে মুখে নিয়ে জন্মেছেন। পল্লীগ্রামের কথা উনি কী জানেন।' আমি বলতে পারি, আমার থেকে কম জানেন তাঁরা যাঁরা এমন কথা বলেন। কী দিয়ে জানেন তাঁরা। অভ্যাসের জড়তার ভিতর দিয়ে জানা কি যায়?"

দেশের মাটিকে তিনি বলেছেন, ভূমিলক্ষ্মী। সেই 'লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে' আসতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। এই লক্ষ্মীকে তাঁর জমিদারির প্রত্যেকটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও স্বেচ্ছায় তিনি নিয়েছিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, জমিদারি প্রজাদের হাতে বিলিয়ে দিয়ে রাতারাতি রাজা হরিশ্চন্দ্র বা দাতা কর্ণের ভূমিকায় তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রজা এবং জমিদারের সম্মিলিত উদ্যোগে একটা মহৎ শক্তি সৃষ্টি করার দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল।

তবে প্রজাদের চরিত্রের দুর্বলতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। সেই কারণে অনেকে তাঁকে ভুল বুঝেছেন। জমিদারি প্রজাদের হাতে তুলে দেওয়ার ইচ্ছে তাঁর ছিল, কিন্তু সেই সম্পর্কেও তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল নানা প্রশ্ন। তিনি স্বীকার করেছেন, 'জমিদার নির্লোভ নয়' এবং এইসঙ্গে বলেছেন: "আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি,

আমাদের দেশের মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকি থাকবে?" কেননা, 'রায়ত-খাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয়' তাঁর জানা ছিল। "তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘরজ্বালানো, ফসল-তছরূপ— কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই।" তা ছাড়া "চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না।"

এই উক্তিতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ আছে বলেই তিনি কালান্তর গ্রন্থে আবার বলছেন: "আমি নিজে জমিদার, এইজন্যে হঠাৎ মনে হতে পারে আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই তা হলে দোষ দেওয়া যায় না— ওটা মানবস্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায় তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায় তাদেরও সেই বুদ্ধি; অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায় যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয়তো শিকারের বিষয়-পরিবর্তন হবে, কিন্তু দাঁতনখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরনের হবে না।"

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য: "জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে, তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে-লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়-যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমে যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকবে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে

জমি ততই অল্পস্বল্প হবেই; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। এমনি করে ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড়ো বড়ো বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে।"

তবু 'জমিদারি ব্যবসায়' যে ফাঁকিবাজি, এ কথা রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই জানতেন। তাই বলেন: "মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয়? কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলাম-চোর খেলার গোলাম যাকেই গতিয়ে দিই, তার দ্বারা গোলামচোরকে ঠেকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে। রক্তপিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে তা বলতে পারি নে।"

১৮৯০ থেকে ১৯২২— প্রত্যক্ষভাবে জমিদারি পরিচালনার কাজে যুক্ত থেকে জমিদার যে কী জিনিস এবং জমিদারি বস্তুটা যে কী সে সম্পর্কে অবশ্য তাঁর মনে অস্পষ্টতা ছিল না। প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' বইয়ের ভূমিকায় তিনি বলছেন: "আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে উপার্জন না করে কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে, আমরা সে জাতের মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায়, আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়— এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই।"

এই একই কথার পুনরাবৃত্তি পাই ১৯৩০ সালে রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে। তিনি লিখছেন: "যেরকম দিন আসছে তাতে

জমিদারির উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেক কাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরো পাকা হয়েছে। যেসব কথা বহুকাল ভেবেছি, এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি-ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।”

প্রতিমা দেবীকে অন্য একটি চিঠিতে ঐ একই সুরে তিনি লিখছেন : “ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েছে। দেনাশোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমাদের গরিব চাষী প্রজাদের পরে যেন আর চাপাতে না হয়। এ কথা আমার অনেক দিনের পুরোনো কথা। বহু কাল থেকেই আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়— আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক পোশাক দাবি করতে পারব কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম, জমিদারির রথ সে রাস্তায় গেল না— তার পর যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল। এতে করে দুঃখ বোধ করেছি— কোনো কথা বলি নি। এবার যদি দেনা শোধ হয়, তা হলে আর একবার আমার বহু দিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।”

তবে জমিদারি ব্যবসায় সম্পর্কে যত বিতৃষ্ণাই থাকুক, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দেশকে চিনেছিলেন ঐ জমিদারি পরিচালনা করতে এসেই। তাঁর জীবনে নতুন মোড় ফিরল ১৮৯১ সালে। তখনই তাঁর অন্য জীবন শুরু। আমরা এবার ফিরে যেতে পারি তাঁর সেই ৩০ বছর বয়সের মধ্যযৌবনে।

সেদিনের সেই চতুর্দশবর্ষীয় বালক এখন পরিপূর্ণ যুবক। তরুণ মুখ-মণ্ডলে যৌবনের দীপ্তি, গৌরবর্ণ মুখমণ্ডলে কৃষ্ণশ্মশ্রুর বিন্যাস, দুই চক্ষু আরো দ্যুতিমান, চলনে বলনে সপ্রতিভ ব্যক্তিত্ব। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এই ধনীর দুলাল ইতিমধ্যে দুই দুইবার ঘুরে এসেছেন বিলেত, কবি হিসাবে খ্যাতিমান; বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেনের সপ্রশংস আশীর্বাদ সেই খ্যাতিকে আরো ব্যাপক করেছে। বাল্মীকিপ্রতিভা, কড়ি ও কোমল, মানসী ইত্যাদি গ্রন্থের তিনি লেখক, সংগীত রচনায় এবং গায়ক হিসাবেও তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত। তদুপরি তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। বিবাহও করেছেন, এক কন্যা ও এক পুত্র তাঁর সংসারে। সংগীতে সাহিত্যে শিল্পে সমাজ-সংস্কারে আভিজাত্যে ঐশ্বর্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তখন ভরা জোয়ার। সেই জোয়ারের টান উপেক্ষা করে নাগরিক সেই যুবক মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে জমিদারির নূতন দায়িত্ব নিয়ে চললেন পদ্মানদীর তীরে শিলাইদহের পল্লীভূমিতে।

তার আগে অবশ্য তিন-চারবার ঘুরে গিয়েছেন মধ্য ও উত্তরবঙ্গের সেই অঞ্চল। প্রথমবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে, দ্বিতীয়বার সেই ১৮৭৫ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে, তৃতীয়বার ১৮৮৯ সালে স্ত্রীপুত্র-কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে বেড়াতে। চতুর্থবার অরুণেন্দ্র-নাথকে নিয়ে ১৮৯০ সালে। মাঝখানে একবার একা যান সাজাদপুর। তৃতীয়বারের সঙ্গী ছিলেন, চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নী, স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর প্রিয়বন্ধু অমলা দাশ। দ্বিতীয়বারে যেমন রবীন্দ্রনাথ রপ্ত হয়েছিলেন ঘোড়ায় চড়া এবং শিকারে, তৃতীয়বার তেমনি অন্য একরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল এই পদ্মা নদীর চরে। তাঁর স্ত্রী বন্ধুসমেত হারিয়ে গিয়েছিলেন বিজন নদীতীরে। রবীন্দ্রনাথের সে কী উৎকণ্ঠা, সে কী আশঙ্কা! ছিন্নপত্রাবলীর একটি চিঠিতে লিখছেন: "নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণচন্দ্রালোক, নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দূরে গফুরের চলনশীল একটি

লণ্ঠনের আলো— মাঝে মাঝে এক এক দিক থেকে কাতর কণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দিকে তার উদাস প্রতিধ্বনি— মাঝে মাঝে আশার উন্মেষ এবং পরমুহূর্তেই সুগভীর নৈরাশ্য— এই সমস্তটা মনে আনাতে হবে। অসম্ভব রকমের আশঙ্কাসকল মনে জাগতে লাগল। কখনো মনে হল চোরাবালিতে পড়েছে, কখনো মনে হল বলু-র হয়তো হঠাৎ মূর্চ্ছা কিংবা কিছু একটা হয়েছে, কখনো বা নানাবিধ শ্বাপদ জন্তুর বিভীষিকা কল্পনায় উদয় হতে লাগল। মনে হতে লাগল— 'আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা, নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ।' স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলুম— বেশ বুঝতে পারলুম বলু বেচারা ভালো মানুষ, দুই বন্ধনমুক্ত রমণীর পাল্লায় পড়ে বিপদে পড়েছে। এমন সময়ে ঘণ্টাখানেক পরে রব উঠল। এঁরা চড়া বেয়ে বেয়ে ওপারে গিয়ে পড়েছেন, আর ফিরতে পারছেন না। তখন ছুটে বোট-অভিমুখে চললুম, বোটে গিয়ে পৌঁছতে অনেকক্ষণ লাগল। বোট ওপারে গেল, বোট-লক্ষ্মী বোটে ফিরলেন।"

কিন্তু ১৮৯১ সালে এই ষষ্ঠ যাত্রার পিছনে রয়েছে ভিন্নতর উদ্দেশ্য, রয়েছে গুরুতর দায়িত্ব। পিতা দেবেন্দ্রনাথের ফরমান নিয়ে জমিদারির কাজ দেখতে তিনি চলেছেন পরগনায়, যাবেন শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর। তিনি সেখানে আর রবীন্দ্রনাথ বা রবিঠাকুর বা রবীন্দ্রবাবু নন, এখন তিনি নতুন বাবুমশায়— 'হুজুর'। তিনি চলেছেন তাঁর প্রথম পুণ্যাহ উৎসবে যোগ দিতে। ট্রেনে শিয়ালদহ থেকে নৈহাটি রানাঘাট চুয়াডাঙা হয়ে কলকাতা থেকে ১১১ মাইল দূর কুষ্টিয়া। সেখান থেকে ছয় মাইল পথ পালকিতে। ষোলো বেহারার পালকি। তার পরই বিরাহিমপুর পরগনার খোরশেদপুর গ্রাম। সেখানেই শিলাইদহ কুঠিবাড়ি ও সদর কাছারি।

শিলাইদহ নামের পিছনে একটু ইতিহাস আছে। পদ্মা ও গোরাই নদীর সঙ্গমে বুনাপাড়ার কাছে প্রাচীন নীলকর সাহেবদের কুঠিবাড়ি ছিল। দুটিই এখন পদ্মার বুকে বিলীন। কুঠিবাড়িটি

কিনেছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ। তারই দোতলা-তিনতলায় থাকতেন ঠাকুরবাবুরা। পরে ১৮৯২ সালে তৈরি করা হয় নতুন কুঠিবাড়ি— এখনো যা স্মৃতিভারে পড়ে আছে পদ্মার তীরে। প্রায় তেরো বিঘা জমির উপর নূতন কুঠিবাড়ি। শিশু আম জাম নিয়ে মনোরম এই পল্লীভবন তৈরির ভার ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র নীতীন্দ্রনাথের উপর। পরে রথীন্দ্রনাথ আরো সংস্কার করেন।

নীলকরদের একজন ছিলেন শেলী নামে সাহেব। তারই নামে হয় শেলীর দহ এবং এই শেলীর দহ থেকেই পরে পাড়ার নাম হয়ে যায় শিলাইদহ। আদি নাম খোরশেদপুর তলিয়ে গেছে ঐ পাড়ার নামের আড়ালে। আসলে কুঠিবাড়ি কাছারি বাড়ি নিয়ে শিলাইদহ পল্লী খোরশেদপুর গ্রামেরই অংশ।

সাজাদপুর পতিসরের তুলনায় এই শিলাইদহের পরিচিতি বেশি। তার কারণ এই জায়গাটিই অনেকখানি জুড়ে আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে ও রবীন্দ্রমননে। শিলাইদহ নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার কুমারখালি থানার একটি গ্রাম। কুমারখালি নামকরা শহর। এইখানেই ছিলেন বহু মনীষী— তান্ত্রিক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, কাঙাল হরিনাথ, জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, প্রফুল্লকুমার সরকার প্রমুখ। আর এখানেই আছে বিখ্যাত বাউল লালন ফকিরের ভিটা আর খোরশেদ ফকিরের দরগা।

পদ্মা ও গোরাই নদীর সংগমে শিলাইদহের কুঠিরহাট। তারই কাছে রবীন্দ্রনাথদের তিনটি মহাল— কয়া, জানিপুর ও কুমারখালি। একটু দূরে ডাকুয়াখালের তীরে পান্টি মহাল— যশোরের প্রান্তে। পদ্মার ওপারে পাবনা, সেখানে সাজাদপুরের জমিদারি এবং উত্তরে উজিয়ে রাজশাহীর কালীগ্রাম পরগনা।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বারবার শিলাইদহর নাম উচ্চারিত হলেও রবীন্দ্রনাথের কর্মের সম্পর্ক পরে বেশি ছিল কালীগ্রাম পরগনার সঙ্গে। সেখানকার সদর কাছারি পতিসরকে কেন্দ্র করে সব রকমের পরীক্ষা বেশি চালিয়েছিলেন তিনি। সব বাদ গিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কালীগ্রাম

পরগনাই আমৃত্যু থাকে রবীন্দ্রনাথের ভাগে। মণ্ডলীপ্রথা, সালিশী, হিতৈষীসভা ইত্যাদি যুগান্তকারী ব্যাপার সফল হয়েছে ঐ পতিসরেই। শিলাইদহের মানুষ রবীন্দ্রনাথের প্রকল্পগুলি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে নি, বরং বাধাই দিয়েছে এবং সেই কারণেই রবীন্দ্র-বিরোধিতাও সেখানেই বেশি। পতিসর তার ব্যতিক্রম।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, ওড়িশার জমিদারি সম্পর্কে বিশেষ কোনো বিবরণ রবীন্দ্রনাথ রেখে যান নি, যদিও ১৮৯৩ সালে বলেন্দ্রনাথকে নিয়ে সেই জমিদারি পরিদর্শন করেন। একমাত্র 'ছিন্ন-পত্রাবলী'তে প্রকৃতি-বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

"ঘন দীর্ঘ তরুশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে গাঢ় গেরুয়া রঙের দিব্যি তক্‌তকে পরিষ্কার পথটি চলে গেছে— দুধারে চষামাঠ নেবে গেছে। আম অশথ বট নারিকেল এবং খেজুর গাছ ঘেরা এক-একটি গ্রাম দেখা যাচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশের মতো জঙ্গল পানাপুকুর ডোবা এবং বাঁশঝাড় নেই— সমস্ত দেশটি যেন ব্রাহ্মণভোজনের জন্যে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে, সবসুদ্ধ বেশ একটি তীর্থের ভাব আছে।"

রবীন্দ্রনাথ বার বার গিয়েছেন তাঁর বাংলাদেশের জমিদারিতে। বৃহৎ কোনো কাজে হাত দেবার আগে ভালো করে জেনেছেন পল্লী-জননীকে আর সেখানকার দুঃখী মানুষদের। গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবার পরই তিনি তাঁর বৃহৎ কর্ম-যজ্ঞের আয়োজন করেন।

প্রথম দিককার পরগনা-ভ্রমণ নিয়ে চমৎকার কিছু বর্ণনা আছে চিঠিপত্র প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত স্ত্রীকে লেখা চিঠিতে এবং ইন্দিরা দেবীকে লেখা 'ছিন্নপত্রাবলী'তে। জমিদারি থেকে স্ত্রীকে যে-সব চিঠি লিখেছেন, তাতে ব্যক্তিগত কথাবার্তাই বেশি। তবে তার থেকে সেখানকার নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন :

"ভিজে বাদলার বাতাস দিয়েছে, সূর্য প্রায় অস্তমিত। পিঠে একখানি শাল চাপিয়ে জোড়াসাঁকোর ছাত আমার সেই ছুটো লম্বা কেদারা এবং সাঁৎলাভাজার কথা এক-একবার মনে করছি। সাঁৎলাভাজা চুলোয় যাক, রাত্রে রীতিমত আহার জুটলে বাঁচি। গোফুর মিঞা নৌকোর পিছন দিকে একটা ছোট্ট উনুন জ্বালিয়ে কী একটা রন্ধন-কার্যে নিযুক্ত আছে। মাঝে মাঝে ঘিয়ে ভাজার চিড়বিড় চিড়বিড় শব্দ হচ্ছে এবং নাসারন্ধ্রে একটা সুস্বাদু গন্ধও আসছে, কিন্তু এক পশলা বৃষ্টি এলেই সমস্ত মাটি।"

ছিন্নপত্রাবলীতে সংকলিত ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠিতে সেই সময়ের অবস্থা ও পরিবেশের বিবরণ প্রচুর। ১৮৯১ সালের জানুয়ারিতে পতিসর কাছারি থেকে লেখা একখানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

"ছোটো নদীটি ঈষৎ বেঁকে এইখানে একটুখানি কোণের মতো একটু কোলের মতো তৈরি করেছে— ছুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে সেই কোলের কোণটুকুতে বেশ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি, একটু দূর থেকে আমাদের আর দেখা যায় না। নৌকাওয়ালারা উত্তর দিক থেকে গুণ টেনে টেনে আসে, হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই এই জনহীন মাঠের ধারে অকারণে একটা মস্ত বোট বাঁধা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়— 'হাঁ গা কাদের বজরা?' 'জমিদারবাবুর।' 'এখানে কেন? কাছারির সামনে কেন বাঁধ নি?' 'হাওয়া খেতে এসেছেন।'— এসেছি হাওয়ার চেয়ে আরও ঢের বেশি কঠিন জিনিসের জন্যে। যা হোক, এরকম প্রশ্নোত্তর প্রায় মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। এইমাত্র খাওয়া শেষ করে বসেছি— এখন বেলা দেড়টা। বোট খুলে দিয়েছে, আস্তে আস্তে কাছারির দিকে চলেছে। বেশ একটু বাতাস দিচ্ছে। তেমন ঠাণ্ডা নয়, ছুপুরবেলার তাতে অল্প গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খসখস শব্দ হচ্ছে। সেই শৈবালের উপরে অনেকগুলো ছোটো ছোটো কচ্ছপ আকাশের দিকে

সমস্ত গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। অনেক দূরে দূরে একটা-একটা ছোটো-ছোটো গ্রাম আসছে। গুটিকতক খোড়ো ঘর,কতকগুলি চালশূন্য মাটির দেয়াল, দুটো-একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ আমগাছ বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটা তিনেক ছাগল চরছে, গোটাকতক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে— নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে; কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে ধরে কলসি কাঁখে জমিদারবাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধরে একটি সদ্যস্নাত তৈলচিক্কণ বিবস্ত্র শিশুও একদৃষ্টে বর্তমান পত্রলেখক সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তি করছে— তীরে কতকগুলো নৌকো বাঁধা এবং একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলেডিঙি অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষা করছে। তার পরে আবার অনেকটা দূর শস্যশূন্য মাঠ— মাঝে মাঝে কেবল দুই-একজন রাখাল শিশুকে দেখতে পাওয়া যায়, এবং দুটো একটা গোরু নদীর ঢালু তটের শেষ-প্রান্ত পর্যন্ত এসে সরস তৃণ অন্বেষণ করছে দেখা যায়। এখানকার দুপুরবেলার মতো এমন নির্জনতা নিস্তব্ধতা আর কোথাও নেই।"

সাজাদপুর থেকে ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেখা আর-একখানা চিঠি : "বেলা দশটার সময় হঠাৎ রাজকার্য উপস্থিত হল— প্রধানমন্ত্রী এসে মৃদুস্বরে বললেন একবার রাজসভায় আসতে হচ্ছে। কী করা যায়, লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠতে হল। সেখানে ঘণ্টাখানেক দুরূহ রাজকার্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসছি। আমার মনে মনে হাসি পায়— আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রমে কাতরভাবে দরবার করে এবং আমলারা বিনীত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের

সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে : আমি যে এই চৌকিটার উপরে বসে বসে ভাণ করছি যেন এই-সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই-সমস্ত ছেলে-পিলে-গোরুলাঙল-ঘরকন্নাওয়ালা সরল-হৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। বোট থেকে কাছারি পর্যন্ত আমি হেঁটে আসবার প্রস্তাব করেছিলুম, নায়েব বিজ্ঞভাবে বললেন, কাজ নেই! কী জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে! prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়।”

শিলাইদহ থেকে ইন্দিরা দেবীকে লেখা আর-একখানা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের কথাটা আরো স্পষ্ট করে বলেছেন : “পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত, আমার তেমনি পদ্মা।... আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো।... একদিনেই কলকাতার সঙ্গে ভাবের কত তফাত হয়ে যায়! কাল বিকেলে সেখানে ছাতে বসেছিলুম সে এক-রকম, আর আজ এখানে দুপুরবেলায় বোটে বসে আছি এ এক-রকম। কলকাতার পক্ষে যা সেন্টিমেন্টাল, পোয়েটি-কাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সত্যিকার সত্যি! পাবলিক নামক গ্যাসালোকজ্বালা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না। এখানকার এই স্বচ্ছ দিবালোক এবং নিভৃত অবসরের মধ্যে গোপনে আপনার কাজ করে যেতে ইচ্ছে করে। নেপথ্যে এসে রঙচঙগুলো

ধুয়ে মুছে না ফেললে মনের শ্রান্তি আর যায় না। 'সাধনা' চালানো, সাধারণের উপকার করা এবং হাঁসফাঁস করে মরাটা অনেকটা অনাবশ্যক বলে মনে হয়— তার ভিতরে অনেক জিনিস থাকে যা খাঁটি সোনা নয়, যা খাদ— আর, এই প্রসারিত আকাশ আর সুবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে যদি কারও প্রতি দৃক্‌পাত না করে আপনার গভীর আনন্দে আপনার কাজ করে যাই, তা হলেই যথার্থ কাজ হয়।"

আর-একটি চিঠি: "আহা, এমন প্রজা আমি দেখি নি— এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই-সমস্ত দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে। এদের ভাষা শুনতে আমার এমন মিষ্টি লাগে— তার ভিতর এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা আছে! এঁরা যখন কোনো একটা অবিচারের কথা বলে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে— অন্য নানা ছলে আমাকে সামলে নিতে হয়। এঁরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য-সহকারে সহ্য করেছে, তবু এদের ভালোবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না।"

পতিসর থেকে লেখা আর-একটি চিঠিও প্রায় এই ধরনের: "এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এদের কোনোরকম কষ্ট দিতে আদবে ইচ্ছে করে না। এদের সরল ছেলেমানুষের মতো অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শুনলে বাস্তবিক মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। যখন তুমি বলতে বলতে তুই বলে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায়, তখন ভারী মিষ্টি লাগে। এক-এক সময় আমি ওদের কথা শুনে হাসি, তাই দেখে ওরাও হাসে।... আমার

এখানকার প্রজারা সেই পরিপূর্ণ ভক্তির সরলতায় সুন্দর। তাদের রেখাঙ্কিত বৃদ্ধ মুখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌকুমার্য আছে।"

পরপর এই কয়খানি চিঠিতে 'নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মমতা কতখানি ছিল, তার প্রমাণ তিনি বার বার দিয়েছেন।

ছেলেবেলার প্রমোদ-ভ্রমণ বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে ছিলেন বা যাতায়াত করেছেন মোটামুটি পঞ্চাশ বছর। জমিদার হিসাবে শেষ যান পতিসরে ১৯৩৭ সালে— যখন তাঁর জগৎজোড়া নাম। শিলাইদহে শেষ যান ১৯২২ সালে। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৮— এই আট বছর তিনি একাই থেকেছেন জমিদারিতে। মাঝে মাঝে গিয়েছেন বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ও অন্য বন্ধুবান্ধবেরা। বেড়াতে এসেছেন লোকেন পালিত, অক্ষয় মৈত্রেয়, জগদিন্দ্রনাথ রায়, কর্নেল মহিম ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রনাথ বসু, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ। পরে শান্তিনিকেতন থেকে গিয়েছেন, পিয়ার্সন ও এণ্ডরুজ সাহেব। ১৯১৫ সালে একবার গিয়েছেন নন্দলাল বসু, সুরেন কর ও মুকুল দে। জোর করে একবার সাজাদপুর কাছারিতে নিয়ে যান ঘরকুনো দুই ভাইপো গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথকে। আসা-যাওয়ার পথের ধারে রানাঘাটে নেমেছেন স্থানীয় হাকিম নবীনচন্দ্র সেনের অনুরোধে। সেখানে তাঁকে শুনিয়েছেন গান। ১৮৯৪ সালে পরিণত যৌবনে রবীন্দ্রনাথের চেহারা কেমন ছিল, তার বর্ণনা দিয়েছেন নবীনচন্দ্র সেন, 'আমার জীবন' গ্রন্থে: 'কী শান্ত কী সুন্দর কী প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরকের মতো দীর্ঘ মুখ, মস্তকের মধ্যভাগে বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশশোভা, কুঞ্চিত অলকশ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণ দর্পণোজ্জ্বল ললাট, ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও শ্মশ্রুশোভান্বিত মুখমণ্ডল, কৃষ্ণপক্ষ্মযুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু— সুন্দর নাসিকায় মার্জিত সুবর্ণের চশমা। বর্ণ-গৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব

উপস্থিত করিয়াছে। মুখোবয়ব দেখিলে চিত্রিত খ্রীষ্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমি পিরান ও চাদর। চরণে কোমল পাদুকা, ইংরাজি পাদুকার কঠিনতা অসহ্যতাব্যঞ্জক।'

শিলাইদহ অঞ্চলের জাগ্রত বিগ্রহ গোপীনাথ। সেবাইত সূত্রে গোপীনাথজীর সেবাপূজা পরিচালনা করতেন ঠাকুরপরিবার। ব্রাহ্ম-ধর্মাবলম্বী হয়েও রবীন্দ্রনাথ গোপীনাথের সেবা করেছেন। রথীন্দ্রনাথ নববধূসহ শিলাইদহে প্রথম এলে তাঁকে সর্বাগ্রে গোপীনাথ মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিগ্রহের আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল। জমিদারি ভাগা-ভাগির পর সুরেন্দ্রনাথের যখন অভিষেক দিলেন রবীন্দ্রনাথ তখনো পালকিতে চাপিয়ে সুরেন্দ্রনাথকে প্রথম নিয়ে যাওয়া হয় গোপীনাথ মন্দিরে— আশীর্বাদ নিতে।

১৮৯৯ সালে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে কুঠিবাড়িতে তিনি পাতেন সুখের সংসার। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী, প্রজাজননী মৃণালিনী দেবী আর বেলা রথী রেণুকা মীরা শমী। সংসার পাতার সঙ্গে সঙ্গে কুঠিবাড়িতেই বসল গৃহবিদ্যালয়। জমিদারি সেরেস্তা থেকে এলেন জগদানন্দ রায় ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিলেট থেকে পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব ও বিলেত থেকে 'পাগলা সাহেব' লরেন্স। বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনা এই শিলাইদহ কুঠিবাড়িতেই।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন শচীন অধিকারী মশাই।— প্রত্যেক দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে উপাসনা ও সামান্য জলযোগ সেরে বেড়াতে বেরোতেন মাঠের মধ্যে একাকী। তাঁর অলক্ষিত একজন বরকন্দাজ দূরে দূরে থাকত। দু-তিন মাইল বেড়াতেন। প্রজাদের 'সেলাম হুজুরের' উত্তরে তাদের সঙ্গে নানা আলোচনায় মত্ত হতেন। কুঠিবাড়িতে ফিরতেন গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে। গান লিখতেন অবিরাম— 'ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান।' তার পর বসত আমলা ও প্রজাদের দরবার।

বেলা এগারোটার মধ্যে আহারাদি সেরে লেখনী ধারণ করতেন। দিবানিদ্রা তাঁর ছিল না। জলনিবাস বোটে থাকতেও এই অবস্থা। মনের মতো করে সুন্দর বৃহৎ জলনিবাস তৈরি করিয়েছিলেন। পদ্মা চিত্রা নাগরবোট আত্রাই ও লালডিঙি। দাঁড়িমাল্লা বাদেও সর্বক্ষণের জন্য দুজন প্রবীণ বরকন্দাজ বোটে থাকত— মেছের সর্দার ও তারণ সিং। থাকত বাবুর্চি গফুর ফরাস ফটিক ও ভৃত্য বিপিন। মাঝে মাঝে আসত পাগল লালা পাগলা ইত্যাদি। বোট বাঁধা থাকত বুনাপাড়ার কোলে অথবা হানিফের ঘাটে। সেখানে প্রায় সারাদিন পল্লী-রমণীদের আনাগোনা। কবি পরমানন্দে তাদের আলাপ-বিলাপ শুনতেন। সাহিত্য সৃষ্টির কড়া তাগিদ এলে তিন-চার দিনের জন্য পদ্মায় কোনো জনহীন কোলের মধ্যে বোট বাঁধা থাকত। হুকুম ছিল কেউ সেখানে যেতে পারবে না। সে কয়দিন কবির জমিদারি-চাকরির ক্যাজুয়েল লীভ।

কুঠিবাড়িতে তখন সরল গৃহস্থালি। মৃণালিনী দেবী প্রজাদের কাছে 'মা-জননী'। তিনিও মাতৃস্নেহে প্রজাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার। কিন্তু হঠাৎ সুখের সংসারের সব-কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। ১৯০১ সালে প্রথম কন্যা বেলার বিয়ের পরই স্ত্রী হলেন পীড়িতা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চলে এলেন শান্তিনিকেতন। প্রতিষ্ঠা হল ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ১৯০২ সালে স্ত্রীর এবং ১৯০৩ সালে বিবাহের কিছুদিন পর রেণুকার মৃত্যু। ১৯০৫ সালে মৃত্যু পিতার, ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠ সন্তান শমীন্দ্রনাথের। শোকে শতছিন্ন কবি।

১৯০৬ সালে কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যা শেখাতে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পাঠালেন আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠা কন্যা মীরা-র বিবাহের পর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিও বিদেশ গেলেন কৃষিবিদ্যা পড়তে। যে যুগে আই. সি. এস. বা ব্যারিস্টারি পড়া ধনী বাঙালি পরিবারের একমাত্র লক্ষ্য, সেই সময় ধনী জমিদার রবীন্দ্রনাথের পুত্র, বন্ধুপুত্র ও

রথীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ও কালীমোহন ঘোষ

জামাতাকে তার বদলে চাষবাস শিখতে বিদেশ পাঠানো অভূতপূর্ব দুঃসাহসিক ঘটনা। বলা বাহুল্য, এই বিদেশ যাত্রার পিছনে কাজ করেছে, জমিদারির উন্নতি বিধান, এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ও ফসল নিয়ে পরীক্ষার তাগিদ।

কলকাতার দুই প্রান্তে কিঞ্চিদধিক শত মাইল দূরে— পূর্বে আর পশ্চিমে কুষ্টিয়া আর বোলপুর, গোড়ার কয়েক বছর বাদ দিলে দুই দিকেই পাতা রইল রবীন্দ্রনাথের সংসার। একদিকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়, অন্যদিকে জমিদারি। শোকের পর শোকে তিনি ক্লান্ত শ্রান্ত জীর্ণ, কিন্তু নতুন কিছু করার অদম্য আগ্রহে তখনো দীপ্ত, কর্মব্যস্ত। ১৯০৩ সালে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়ের অকালমৃত্যুর পর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে এল শিলাইদহ কুঠি-বাড়িতে। চার মাস পর আবার শান্তিনিকেতনে। কুঠিবাড়ির গৃহশিক্ষকরাই হলেন শান্তিনিকেতনের আদি শিক্ষক।

১৯০৮ সালে গ্রামের কাজে যোগ দিলেন কালীমোহন ঘোষ। উৎসাহী তরুণ যুবক। তাঁর উপর ভার পড়ল গ্রামোন্নয়নের। সে বছরই যুগান্তকারী মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তন। তার আগে যোগ দিয়েছেন শৈলেন মজুমদার, চন্দ্রময় সান্যাল ও কালীমোহনের মতোই একনিষ্ঠ দেশসেবক অতুল সেন। ১৯০৯ সালে রথীন্দ্রনাথরা বিলেত থেকে ফিরে শুরু করলেন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, সার, পাম্প ইত্যাদির ব্যবহার। আজ যে পন্থায় চাষ সারা ভারতে, কোনোপ্রকার ঢক্কা-নিনাদ না করেই এদেশে সর্বপ্রথম চালু করেন রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ। কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ৮০ বিঘা খাস জমিতে শুরু হয় সেই গবেষণাগার। ১৯১০ সালে রথীন্দ্রনাথের বিবাহের পর কুঠিবাড়ির গৃহলক্ষ্মী হলেন প্রতিমা দেবী।

১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। পরের বছরই শান্তিনিকেতনের পরিপূরক শ্রীনিকেতন সৃষ্টি। পল্লী সংগঠনের অনেক পরিকল্পনা

স্থানান্তরিত হল শ্রীনিকেতনে। এলমহার্স্ট সাহেব ও কালীমোহন ঘোষ নিলেন তার ভার। লক্ষণীয় যে, ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ শেষ যান শিলাইদহে, সেই বছরই জমিদারির সাফল্য আর ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা দিয়ে শ্রীনিকেতনে নতুন কর্মযজ্ঞ শুরু।

রবীন্দ্রনাথের মন যদিও পড়ে ছিল মধ্য ও উত্তর বাংলার গ্রামে, তবু মণ্ডলীপ্রথা নিয়ে প্রতিকূলতা, দেনার দায় ও পারিবারিক নানা সমস্যা তাঁকে বাধ্য করে বীরভূমের গ্রামে চলে আসতে। ওদিকে জোড়াসাঁকোয় বিভিন্ন অংশের পরিবার দিনদিন বাড়ছে, তাদের খরচও বাড়ছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নানা উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার চাপে জমিদারির আয় ততটা বাড়ছে না। ফলে পারিবারিক নানা কলহও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ তাই অবশেষে আশ্রয় নিলেন বীরভূমের পল্লীতে, শান্তিনিকেতন আর শ্রীনিকেতন নিয়ে নতুন পরীক্ষায়। সেখানে আমলা নেই, মহাজন নেই, এজমালি সম্পত্তি নেই— একেবারে ভিন্ন পরিবেশ। তবু স্বীকার করতেই হবে যে, নিজ জমিদারিতে রবীন্দ্রনাথ যে-ধরনের দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়েছিলেন, শ্রীনিকেতনেও তা পারেন নি। জমিদারি পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে পল্লী-সংগঠনের আদিপর্বে বাংলাদেশের মরা গাঙে তিনি জোয়ার এনেছিলেন। ১৮৯১ সালে প্রথম যখন জমিদার হয়ে এলেন পুণ্যাহ উৎসবে যোগ দিতে, তখনো তিনি ভাবতে পারেন নি, ভূমিলক্ষ্মী তাঁকে কোন্ পথে নিয়ে যাবেন।

তাই ১৮৯১ সালে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে আবার ফিরে গিয়ে আমরা দেখতে পাই সংশয়াচ্ছন্ন চিন্তাক্লিষ্ট এক যুবককে। বঙ্গজননীর যে মূর্তি তিনি অন্যত্র দেখেছেন, তার সঙ্গে এর মিল নেই। নিত্য-কল্যাণীলক্ষ্মী বঙ্গজননীর 'বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা, সম্মুখে কষ্টের সংসার, বড়োই দরিদ্র শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।' মুহূর্তের মধ্যে তিনি কর্তব্য স্থির করে ফেললেন, প্রতিজ্ঞা করলেন, এই অন্ধকারে আশার

আলো জ্বালানোই এখন তাঁর একমাত্র কাজ। তাই জমিদারির ভার নেবার প্রথম দিন পদ্মাতীরে সূর্যস্নাত প্রথম প্রভাতে কুঠিবাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝি মনে মনে বলেন— 'আঘাত-সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি, অঙ্গদ-কুণ্ডলকণ্ঠী অলংকাররাশি খুলিয়া ফেলেছি দূরে।'

ওদিকে পুণ্যাহ উৎসবের আয়োজন সমাপ্ত। বন্দুকের আওয়াজ রোশনচৌকি হুলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনিতে কাছারি মুখর। নতুন বাবু-মশাই কাছারিতে নেমে এলেন। ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদরে শান্ত সৌম্য মূর্তি। প্রথামতো প্রারম্ভে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের প্রার্থনা এবং পরে হিন্দুমতে পূজা। পুরোহিত বাবুমশায়ের কপালে পরিয়ে দিলেন চন্দনের তিলক। তিনি তখন দেবেন নতুন কাপড় চাদর দধি মৎস্য ও দক্ষিণা এবং এর পরেই প্রজাদের করদানের পর্ব।

কিন্তু হঠাৎ চিরাচরিত প্রথায় বিঘ্ন। রবীন্দ্রনাথ বিরক্ত। তিনি ঘোষণা করলেন এভাবে পুণ্যাহ উৎসব চলবে না। পুণ্যাহ মিলনের দিন, পুণ্যাহ বিভেদ ভোলার দিন, কিন্তু এই উৎসবের আয়োজনে যে তার বিপরীত ব্যবস্থা! গোমস্তা নায়েবরা শঙ্কিত। কী ব্যাপার? বাবুমশায় অসন্তুষ্ট কেন? সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতেই রবীন্দ্রনাথ জানালেন, আসনের ব্যবস্থায় জাতিভেদ তিনি মানবেন না। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটালে পুণ্যাহ উৎসব হবে না।

প্রিন্স দ্বারকানাথের আমল থেকে সম্ভ্রম ও জাতিবর্ণ -অনুযায়ী পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে থাকে বিভিন্ন আসনের বন্দোবস্ত। হিন্দুরা চাদর-ঢাকা সতরঞ্চির উপর এক ধারে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণের স্থান আলাদা এবং চাদর ছাড়া সতরঞ্চির উপর মুসলমান প্রজারা অন্য ধারে। সদর ও অন্য কাছারির কর্মচারীরাও নিজ নিজ পদমর্যাদামতো বসেন পৃথক পৃথক আসনে। আর বাবুমশায়ের জন্য ভেলভেটমোড়া সিংহাসন।

বরণের পর রবীন্দ্রনাথের সিংহাসনে বসার কথা। কিন্তু তিনি

বসলেন না। সদর নায়েবকে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন: "নায়েব মশাই, পুণ্যাহ উৎসবে এমন পৃথক পৃথক ব্যবস্থা কেন?" এই অভাবিত প্রশ্নে বিস্মিত নায়েব বলেন: 'বরাবর এই নিয়ম চলে আসছে।' রবীন্দ্রনাথ জবাব দেন: "না, শুভ অনুষ্ঠানে এ জিনিস চলবে না। সব আসন তুলে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সবাইকে একইভাবে একই ধরনের আসনে বসতে হবে।" নায়েবমশাই প্রথার দাস। তিনি বলেন, এই আনুষ্ঠানিক দরবারে প্রাচীন রীতি বদলাবার অধিকার কারো নেই। রবীন্দ্রনাথ আরো রুষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দেন: "আমি বলছি, তুলে দিতে হবে। এ রাজ-দরবার নয়, মিলনানুষ্ঠান।" সদর নায়েবের সেই একই জবাব— 'অসম্ভব, নিয়ম ভাঙা চলবে না।'

উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত, বিস্মিত। নতুন বাবুমশায়ের আচরণে কারো মুখে কথা নেই। সদর নায়েব আবার রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন সিংহাসনে বসতে। কিন্তু তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আসনের জাতিভেদ দূর না করলে তিনি কিছুতেই বসবেন না, সাধারণ দরিদ্র প্রজার অপমান তিনি সহ্য করবেন না। সদর নায়েব জমিদারের হুকুম অমান্য করায় রবীন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন: "প্রাচীন প্রথা আমি বুঝি না, সবার একাসন করতে হবে। জমিদার হিসাবে এই আমার প্রথম হুকুম।"

জমিদারি সম্ভ্রম আর প্রাচীন প্রথায় আস্থাবান সদর নায়েব ও অন্যান্য হিন্দু আমলারা একসঙ্গে হঠাৎ ঘোষণা করে বসলেন, প্রথার পরিবর্তন ঘটালে তাঁরা একযোগে পদত্যাগ করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অবিচলিত। তিনি উপস্থিত বিরাট প্রজামণ্ডলীকে উদ্দেশ করে বললেন: "এই মিলন উৎসবে পরস্পরে ভেদ সৃষ্টি করে মধুর সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া চলবে না। প্রিয় প্রজারা, তোমরা সব পৃথক আসন, পৃথক ব্যবস্থা— সব সরিয়ে দিয়ে, একসঙ্গে বসো। আমিও বসব। আমি তোমাদেরই লোক।"

অপমানিত নায়েব-গোমস্তার দল সবিস্ময়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে হিন্দু-মুসলমান প্রজারা প্রকাণ্ড হলঘরের সব চাদর সব চেয়ার নিজেরাই সরিয়ে দিয়ে ঢালা-ফরাশের উপর বসে পড়ল। মাঝখানে বসলেন রবীন্দ্রনাথ। সে এক অপরূপ দিব্যমূর্তি। প্রজারা মুগ্ধ হয়ে দেখল তাদের নতুন বাবুমশাইকে।

মিলন উৎসবে কারো মনে ব্যথা দেওয়া অনুচিত। প্রজাদেরই তাই রবীন্দ্রনাথ বললেন: "যাও, সদর নায়েব আর আমলাদের ডেকে আনো, সবাই একসঙ্গে বসে পুণ্যাহ উৎসব করি।" রবীন্দ্রনাথ আমলাদের অনুরোধ করলেন পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে। উৎসব শুরু হল। দলে দলে আরো লোক কাছারিবাড়িতে এসে ভেঙে পড়ল। এবং সেদিন থেকে ঠাকুর এস্টেটের পুণ্যাহ সভায় শ্রেণীভেদের ব্যবস্থা উঠে গেল।

কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনা আর রবীন্দ্রনাথের মুখে প্রারম্ভিক ভাষণ সেই মুহূর্তেই বীজ বপন করল নতুন সংঘাতের। দরিদ্র প্রজারা বুঝতে পারল, তাদের দুঃখের দিন ঘোচার লগ্ন উপস্থিত, আর আমলারা এবং সম্পন্ন মহাজনেরা জেনে গেলেন, তাঁদের দুঃসময়ের শুরু। আর রবীন্দ্রনাথ? তিনিও জেনে গেলেন তাঁর সম্মুখে কঠিন পরীক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো সংকল্পবদ্ধ হলেন, আরো স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এখানে তাঁকে কী করতে হবে, কিভাবে অগ্রসর হতে হবে এবং প্রতি পদে বাধা আসবে কোন্ পক্ষ থেকে। সেই দিনই তিনি তাই ঘোষণা করলেন, "সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচাতে হবে। এটাই আমার সর্বপ্রধান কাজ।"

'সাহা' বলতে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কোনো জাতিকে বোঝান নি। 'শেখ' বলতেও তা নয়। যেহেতু তাঁর জমিদারিতে অধিকাংশ মহাজনই সাহা সম্প্রদায়ের হিন্দু, সেইজন্যই মহাজন অর্থে তিনি 'সাহা' শব্দের ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে অধিকাংশ

দরিদ্র প্রজাই মুসলমান। তাই 'শেখ' বলতে তিনি দরিদ্র প্রজাদেরই বুঝিয়েছেন।

এই সম্পর্কে 'রায়তের কথা'য় প্রমথ চৌধুরী মশাই চমৎকার বলেছেন: 'রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কী করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি— কেননা তাঁর জমিদারি সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে শেখদের বাঁচানো। কিন্তু সেইসঙ্গে এও আমি বেশ জানি যে, বাংলার জমিদারমাত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেও যেমন জমিদার হিসেবেও তেমনি unique।'

৫

পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ১৯৩০ সালে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: "আমি যা বহু কাল ধ্যান করেছি, রাশিয়ায় দেখলুম এরা তা কাজে খাটিয়েছে। আমি পারি নি বলে দুঃখ হল, কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে লজ্জার বিষয় হবে।"

রবীন্দ্রনাথ 'বহু কাল ধ্যান' কী করে করেছিলেন এবং কী করতে পারেন নি বলে দুঃখিত? তা ছাড়া জনৈক আমলাকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছেন, জমিদারিতে 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রস্তাবিত ধর্মরাজ্যের চেহারাটাই বা কী?

প্রমথ চৌধুরী মশাই বলেছেন, জমিদার হিসাবেও রবীন্দ্রনাথ ইউনিক। এই অভিনবত্বের সন্ধানে যাবার আগে একটি কথা পরিষ্কার বলে নেওয়া দরকার, রবীন্দ্রনাথ পল্লী অঞ্চলে জমিদারির ভার নিয়েও জমিদার হিসাবে যান নি, গিয়েছিলেন স্বদেশহিতৈষী কর্মী রূপে। সাধারণ মানুষের ধারণা, জমিদার বাবুমশাই দু'হাতে দান খয়রাত করবেন, জোর করে খাজনা আদায় করবেন, আমলাদের হাতে তামাক খাবেন, দু-চার দিন কাছারিতে আনন্দোৎসব করে স্বস্থানে

ফিরে যাবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখে ওরা হতবাক। ইনি অন্য রকম, দান খয়রাতের বালাই নেই, খাজনা নিয়ে চাপও দেন না এবং আমলারা তাঁর ভয়ে কম্পমান। তাই এই নতুন বাবুমশাইকে নিয়ে তাদের মনে নানারকম দ্বিধা, নানারকম সংশয়। বাধাও এল গোড়া থেকেই। যার স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে, সে তো বাধা দিলই, আর যার স্বার্থ রক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ হাত বাড়ালেন, সেই অজ্ঞ দরিদ্র চাষীদের অনেকে ভুল বুঝে আমলার ক্রীড়নক হল।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এসেই ইন্দিরা দেবীকে এক চিঠিতে লিখলেন : "আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে। এরা যেন বিধাতার শিশু সন্তানের মতো— নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে, কোনোমতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়।"

রবীন্দ্রনাথ এলেন এই প্রজাদের অভিভাবকরূপে। এসেই আত্মীয়তা পাতালেন চাষীদের সঙ্গে, কড়া নজর রাখলেন আমলা মহাজন আর জোতদারদের উপর। কিন্তু, আগেই বলেছি, তার মানে, এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেকে একজন 'দয়ালু হুজুর' হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল প্রজাদের স্বাবলম্বী করা, আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ করা এবং ভূমিলক্ষ্মীর আরাধনায় জয়যুক্ত করা। কিন্তু প্রথা আছে, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব আছে, উপরন্তু সব সম্পত্তিই এজমালি। দয়া দাক্ষিণ্য আর প্রগতি দেখিয়ে সংসারের ভাঁড়ার শূন্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি এ কথাও বলেছেন সঙ্গে সঙ্গে : "আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তাহলে আমি এদের বড় সুখে রাখতুম এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সুখে থাকতুম।"

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে সেকালে জমিদাররা ছিলেন

ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব আদায়কারী। প্রচুর ক্ষমতাও ছিল তাঁদের হাতে। তাই জমিদারদের বিলাস ও প্রজাপীড়নও পাল্লা দিয়ে চলেছিল। রাজস্বের চাপ এড়াতে খাজনা বৃদ্ধিও চলেছে। এই কাজে জমিদারদের সহায় আমলারা। এই আমলারা আবার হাত মেলান মহাজন ও জোতদারদের সঙ্গে। এদেরই অত্যাচারে দরিদ্র চাষী দরিদ্রতর হয়। রবীন্দ্রনাথ বছর দুই জমিদারির সব অঞ্চল ঘুরে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। আমলার বিরুদ্ধে প্রজারা নালিশ করলে তিনি প্রজার কথাই বিশ্বাস করেছেন। বহু আমলার চাকরিও গেছে এই কারণে।

'জমিদারি ব্যবসায়'কে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে 'ধর্মরাজ্যে' পরিণত করেছিলেন, তার এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন একজন ব্রিটিশ সাহেব অল্প কয়েকটি কথায়। সাহেবদের রবীন্দ্রভক্তি থাকার কোনো কারণ নেই, বরং তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সন্দেহের চোখেই দেখতেন। লাঠিখেলা স্বদেশীমেলা ইত্যাদির উপর কড়া নজর রাখতেন তাঁরা। তারই মধ্যে ১৯১৬ সালের রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ারে এল. এস. এস. ও-ম্যালে আই. সি. এস. জমিদার-রবীন্দ্রনাথের রূপ চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখছেন :

'It must not be imagined that a powerful landlord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the Settlement Officer's account of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengali poet, whose fame is world-wide. It is clear that to poetical genius he adds practical and beneficial ideas of estate management, which should be an example to the local Zemindars.

A very favourable example of estate government is shown in the property of the poet, Sir Rabindra-

nath Tagore. The proprietors brook no rivals. Sub-infeudation within the estate is forbidden, raiyats are not allowed to sublet on pain of ejectment. There are three divisions of the estate, each under a Sub-manager with a staff of tahasildars, whose accounts are strictly supervised. Half of the Dakhilas are checked by an officer of the head office. Employees are expected to deal fairly with the raiyats and unpopularity earns dismissal. Registration of transfer is granted on a fixed fee, but is refused in the case of an undesirable transferee. Remissions of rent are granted when inability to pay is proved. In 1312 it is said that the amount remitted was Rs. 57,595. There are Lower Primary Schools in each division and at Patisar, the centre of management, there is a High English School with 250 students and a Charitable dispensary. These are maintained out of a fund to which the estate contributes annually Rs. 1250 and the raiyats 6 pies to rupee in their rent. There is an annual grant of Rs. 240 for the relief of cripples and the blind. An agricultural bank advances loans to raiyats at 12 percent per annum. The depositors are chiefly Calcutta friends of the poet, who get interest at 7 per cent. The bank has about Rs. 90,000 invested in loans.'

রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পরিচালনার মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায় ঐ বিবরণে। কোনো রবীন্দ্রভক্ত বাঙালির নয়, জনৈক

শাসক সাহেবের এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রমাণ করে যে, অভাবিত বহু ঘটনা দীর্ঘদিন আগে রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে ঘটে গেছে বাংলার পল্লীতে। জনপ্রিয়তা হারালে চাকরি হারানো— আজও কি কেউ ভাবতে পারে?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ জমিদারির আয়ও বাড়িয়েছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীদের মতো খেয়ালখুশিতে খাজনা মকুবের বাসনা তাঁর ছিল না। প্রকৃত দুঃস্থকে কিংবা অজন্মা হলে তিনি রেহাই দিয়েছেন। অন্য জমিদাররা ঠিক এইভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন না বলে বহু প্রজা রবীন্দ্রনাথের উপর চটে যান। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কর্ণপাত করেন নি। প্রজারা ভিখারীর মতো জমিদারের কাছে কেবল হাত পাতুক, এ জিনিসটা রবীন্দ্রনাথ আদৌ চান নি। তা ছাড়া যখন উন্নত ধরনের চাষে ও নানা প্রগতিশীল ব্যবস্থায় ফসলের উৎপাদন বাড়ল, রবীন্দ্রনাথ খাজানার হারও বাড়িয়ে দেন। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য বাবুমশায়ের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ যে কত 'অত্যাচারী', এ কথাও প্রচার হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাতে বিচলিত হন নি, অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রজাদের শান্ত করেন এবং বলেন, বাড়তি টাকার অধিকাংশই খরচ হবে চাষ ও চাষীর কল্যাণে। প্রজারা আবার অনুগত হয় এবং দেখে যে, সত্যি সত্যিই রবীন্দ্রনাথ জমিদারির আয় থেকে আরো বেশি টাকা প্রজাদের জন্য খরচ করছেন।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলে নিই। শিলাইদহে ১৯২২ সালে শেষ যাত্রার সময় রবীন্দ্রনাথকে প্রজা-জমিদার এক বড়ো বিরোধের মধ্যস্থ হতে হয়েছিল। শিলাইদহ চরের প্রজা ইসমাইল মোল্লা ছিলেন বিদ্রোহী প্রজাদের নায়ক। প্রায় দুশো ঘর প্রজা তাঁর নেতৃত্বে ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজারদের সঙ্গে স্বার্থ নিয়ে লড়-ছিলেন। দুদিনে প্রায় ছয় ঘণ্টা দুপক্ষের বক্তব্য শুনে রবীন্দ্রনাথ সরেজমিনে অবস্থাটা দেখতে চর অঞ্চলে যান। প্রায় চার ঘণ্টা চরের

অবস্থা দেখে এবং দু পক্ষের বক্তব্য শুনে রবীন্দ্রনাথ যে রায় দেন, সবাই তা মেনে নেন এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের এই রায়ের অনুকরণেই বেঙ্গল টেন্যানসি অ্যাক্ট সংশোধন করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথেরা অবশ্য অন্যান্যদের তুলনায় ধনী জমিদার ছিলেন না। ঠাকুর এস্টেটের কাছাকাছি জমিদারি ছিল নাটোরের জগদিন্দ্র-নাথ রায়ের, শীতলাইয়ের যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রের, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর, নলডাঙার রাজার। দীঘাপতিয়াও অদূরে। এঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ধনী ছিলেন। কিন্তু সম্মান ও প্রতিপত্তিতে ঠাকুরবাবুরা ছিলেন সবার উপরে।

পল্লী সংগঠনের প্রথম পর্যায়েই রবীন্দ্রনাথ চালু করেন হিতৈষী বৃত্তি ও কল্যাণ বৃত্তি। সেই বাবদ সংগৃহীত সব টাকাই ব্যয় হত জমি ও প্রজার উন্নয়নে। প্রজাদের কাছ থেকে হাল বকেয়া খাজনার টাকা প্রতি তিন পয়সা হিসাবে হিতৈষী বৃত্তি আদায় হত। জমিদারি সেরেস্তা থেকে মোট সংগৃহীত টাকার সমপরিমাণ দেওয়া হত এবং সেই টাকা খরচের ব্যবস্থা করত প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হিতৈষী সভা। কল্যাণবৃত্তিও টাকায় তিন পয়সা। তার জন্যে আলাদা রসিদও দেওয়া হত এবং আদায়ের সমপরিমাণ টাকা দিতেন জমিদার নিজে। বছরে এই ভাবে পাঁচ-ছয় হাজার টাকা সংগৃহীত হত। তা ছাড়া সায়রাত মহাল বন্দোবস্ত হলে মোট নজরের শতকরা আড়াই টাকা ও নাম খারিজের নজরানা সরকারী আইনে শতকরা পাঁচ টাকা আদায় হত। এই টাকাই ব্যয় হয়েছে রাস্তাঘাট নির্মাণে, মন্দির মসজিদ সংস্কারে, স্কুল-মাদ্রাসা স্থাপনে আর চাষীদের বিপদ-আপদের সাহায্যে।

গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়ল শিক্ষা ও চিকিৎসার দিকে। প্রত্যেকটি গ্রামে জমিদার ও গ্রামবাসীদের টাকাতেই যৌথ উদ্যোগে বসল প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিন বিভাগে তিনটি মাইনর স্কুল এবং সদর কাছারিতে হাইস্কুল। সেখানকার ছাত্রাবাসও তৈরি হল একই

পদ্ধতিতে। ছাত্রাবাস ও ইস্কুলবাড়ির খরচ হিতৈষী সভা থেকে দেওয়া সম্ভব ছিল না বলে রবীন্দ্রনাথ এস্টেট থেকে সব টাকা দেন।

শিলাইদহে স্থাপিত হয় মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়। এই চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথি কবিরাজী অ্যালোপ্যাথি— তিন পদ্ধতিতেই চিকিৎসা হত। কুইনিন বিলি হত বিনামূল্যে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও চিকিৎসা করতেন মাঝে মাঝে। তা ছাড়া পতিসরে বসানো হয় বড়ো হাসপাতাল এবং কালীগ্রাম পরগনার তিনটি বিভাগে থাকেন তিনজন ডাক্তার। হেলথ কো-অপারেটিভ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা সারা ভারতে সর্বপ্রথম চালু করেন রবীন্দ্রনাথ, করেন তাঁর জমিদারিতেই।

মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে একখানা অনুপম চিঠি লেখেন ১৯১৭ সালে— "এই ডাক্তার এবং ডাক্তারখানায় আমাদের জমিদারির এবং তারও চতুষ্পার্শ্বের লোকের বিশেষ উপকার হয়েচে এই কথা যখন শুনতে পাই তখন সকল অভাবের দুঃখের উপর ঐ সুখটাই বড় হয়ে ওঠে। বিরাহিমপুরে প্রজাহিতের এই একটিমাত্র কার্য্যে সফল হয়েচি। লজ্জা এই যে হাঁসপাতালের চাঁদা আদায় ক'রে আজপর্য্যন্ত তার একটি ইঁটও ভিতের উপর চড়ে নি। আমাদের যা কিছু দেনা হয়েচে তা যদি আমাদের জমিদারির এই রকম কাজের জন্য হত আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য শোক করতুম না— কেননা এই ঋণ অন্যদিকে এমনভাবে সেণ্ট-পারসেণ্ট সুদের উপরে শোধ হত যে হ্যাণ্ডনোট লিখে আনন্দ করতুম। আমার তো সবচেয়ে দুঃখ হয় এই জন্যে যে, প্রজাদের জন্যে লোকসান করবার পূর্ণ অধিকার আমার হাতে নেই তা হলে আমি শান্তিনিকেতন ছেড়ে ওদের মধ্যে গিয়ে বসতুম— মনের সাধে বিষয় নষ্ট করতে করতে সুখে মরতুম। তাই অর্থ নষ্ট করবার যে সুবিধাটুকু এই জায়গায় তৈরি করতে পেরেচি তাই নিয়ে অন্তিমকাল পর্য্যন্ত কেটে যাবে— তার পরে যারা বিষয় ভোগ করচে, তারা তার দায়ও ভোগ করবে,

তাতে এই বিশ্বজগতের কী আসে যায়, আর ; আমারি বা কি মাথা-ব্যথা !"

সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা তো হলই, কুটিরশিল্পের উন্নয়নেও হাত দিলেন তিনি। বয়নশিল্প শেখাতে শ্রীরামপুরে নিয়ে যাওয়া হল একজন তাঁতিকে। স্থানীয় একজন মুসলমান জোলাকে পাঠানো হল শান্তিনিকেতনে তাঁতের কাজ শিখতে। তিনি এসে খুললেন তাঁতের ইস্কুল। পটারির কাজেও হাত দেওয়া হল একই সময়ে। রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লেখেন :

"বোলপুরে একটা ধানভানা কল চল্‌চে— সেইরকম একটা কল এখানে [পতিসরে] আনাতে পারলে বিশেষ কাজে লাগ্‌বে। এ দেশ ধানেরই দেশ— বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশি ধান এখানে জন্মায়। ...তারপরে এখানকার চাষাদের কোন্ industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না।— এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জান্‌তে চাই Pottery জিনিসটাকে Cottage industryরূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস— ছোটখাটো furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা। আরেকটা জিনিষ আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে। নগেন্দ্র বল্‌ছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আন্‌তে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না— খোলা পেলে সুবিধা হয়।"

চাষীদের স্বাবলম্বী ও অতিরিক্ত আয়ের জন্যে রবীন্দ্রনাথ শুধু চিঠি লিখেই ক্ষান্ত হন নি, হাতে কলমে কাজও করিয়েছেন। রাস্তাঘাট নির্মাণেও ছিল তাঁর উৎসাহ। কুষ্টিয়া থেকে শিলাইদহ পর্যন্ত ছ

মাইল রাস্তা তিনি তৈরি করিয়ে দেন। কিন্তু মেরামতির দায়িত্ব দেন স্থানীয় গ্রামবাসীর উপর। কালীগ্রাম চলনবিল-সংলগ্ন। বর্ষায় নৌকো বেয়ে ধানের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হত। সাধারণ ফাণ্ড থেকে কয়েকটি রাস্তা এবং এস্টেট থেকে পতিসর-আত্রাই স্টেশন পর্যন্ত সাত মাইল রাস্তা বানিয়ে দেওয়া হয়। কুয়ো খোঁড়ার দায়িত্ব দেন গ্রাম-বাসীকে আর তিনি নিজে এস্টেট থেকে কুয়ো বাঁধানোর দায়িত্ব নেন। পুকুর সংস্কারও চলে একই রীতিতে। পতিসরে তিনি একটি ধর্মগোলাও বসান।

শিলাইদহে এবং পতিসরে রবীন্দ্রনাথ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বসান। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যা শিখে এসে। ৮০ বিঘা জমি জুড়ে শিলাইদহে বসে কৃষিক্ষেত্র। আমেরিকার ভুট্টা আলু টমেটো আখ ইত্যাদির চাষ শুরু হয়। সেই ১৯১০ সালে ব্যবহৃত হয় ট্রাক্টর পাম্পসেট সার এবং চাষ হয় অধিক ফলনশীল ফসল। ইলিশ মাছ নৌকো বোঝাই শস্তায় কিনে চুন দিয়ে মাটিতে পুঁতে হয় সার। অধিক ফলনের জন্য বসানো হয় কৃষি ল্যাবরেটরি।

পতিসরে রথীবাবু নিজেই ট্রাক্টর চালান। পরে কয়েকজনকে শিখিয়ে ট্রাক্টর চালানোর ভার অন্যদের দেন। প্রথম যেদিন ট্রাক্টর চলে, দেখতে ভিড় হয় হাজার হাজার গ্রামবাসীর। আল বাঁচিয়ে ট্রাক্টর চালানো সম্ভব ছিল না বলে, চাষীরা আল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কোদাল হাতে পাশে দাঁড়িয়ে তৎক্ষণাৎ আবার আল তৈরি করে দেয়। ট্রাক্টর চাষীদের হাতে রবীন্দ্রনাথ এমনি দিয়ে দেন নি। মেরামত ও চালকের মাইনের জন্যে বিঘা প্রতি এক টাকা আদায় করেন। পরে চাষীদের মধ্যে ট্রাক্টরে চাষের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। একটা ট্রাক্টরে চাহিদা মিটছিল না।

আলু চাষেও রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল প্রবল। জমিকে দুই বা তিন ফসলা করার জন্যে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমে আলু চাষ

শুরু হয় কবি-নাট্যকার ও কৃষিবিশারদ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে। কিন্তু তাতে লোকসানই হয় বেশি।

কালীগ্রামে চাষ সম্পর্কে ১৯০৮ সালে এক চিঠিতে জনৈক কর্মীকে লিখছেন: "প্রজাদের বাস্তুবাড়ি, ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস কলা খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সূতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল, আঙ্গুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের আলু চাষ সম্পর্কে ল্যাণ্ড রেকর্ডস অব এগ্রিকালচারে ১৮৯৯ সালের বার্ষিক রিপোর্টে লেখা আছে:

Experiment with Nainital Potatoes were made by Mr. Rabindranath Tagore in the Tagore Estate at Shelidah in the Kusthia Sub-division. The crop was not satisfactory owing to the defective cultivation. One of Mr. Tagore's continents, however, working under more favourable circumstances obtained a bumper crop from a portion of the same seed, and success of the experiment is said to have induced several neighbouring Rayots to take the potato cultivation. Their experiments together with others introduced by Mr. Tagore on his farm will be continued.

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ প্রবন্ধে তিনি বলছেন: "শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চার দিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষা-ব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক

পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্টরে যারা এগ্রিকালচারাল্ কলেজে পাস করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি।"

আলু চাষের ব্যর্থতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যতই ঠাট্টাতামাসা করুন, ভুট্টা কপি পাটনাই-মটর আখ ইত্যাদি চাষে তিনি প্রজাদের উৎসাহিত করেছিলেন। ঢাকা থেকে গাণ্ডারি নামক আখ এনে তিনি শিলাইদহে চালু করেন। সেইসঙ্গে চলেছিল গুটিপোকার চাষ। রেশমও তৈরি হল। কিন্তু বাজারে চলল না, কারণ কাটতি নেই। সেই সময়ে জগদীশচন্দ্র বসুকে এক চিঠিতে লেখেন: "অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্র আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি— দশ বারো জন লোক অহর্নিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনাবার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।"

এবারে সালিশী। 'মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়', প্রজানুরঞ্জনের কাজে হাত দিয়ে প্রথমে নিজস্ব বিচার-ব্যবস্থা চালু করলেন। তাঁর আমলে জমিদারির মধ্যে কোনো বিবাদ নিয়ে প্রজারা আদালতে যেত না। প্রত্যেক গ্রামের লোকেরা তাঁদের ভিতর থেকে একজনকে প্রধান মনোনীত করতেন। ঐ গ্রাম-প্রধানরাই পরে আবার পরগনার সব প্রধানদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে মনোনীত করতেন। তাঁদের বলা হত পঞ্চপ্রধান। বিবাদ ও বিরোধ পঞ্চপ্রধানরাই মিটিয়ে দিতেন। শেষ আপিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। এই বিচারে অসন্তুষ্ট হয়ে কোনো পক্ষ আদালতে

নালিশ করলে গ্রামের লোকেরা তাঁকে সমাজচ্যুত করে দিতেন। প্রজারা এই সালিশীপ্রথা মেনেছিল আর-একটি কারণে। আদালতের মামলায় অনেক ঝামেলা, অনেক টাকার শ্রাদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বিচার-ব্যবস্থায় মামলার কোনো খরচ লাগত না। এই ব্যবস্থা কালীগ্রাম পরগনায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও চালু ছিল। বন্ধ হয়ে যায় দেশ বিভাগের পর।

সমবায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহও সেই সময়ে, তাঁর কর্ম-জীবনের সেই আদিযুগে। তিনি পরিষ্কার বুঝেছিলেন, গ্রামকে বাঁচাতে হলে 'সমবায়নীতি ছাড়া আমাদের উপায় নেই।' তা ছাড়া তাঁর ধারণা 'অতিকায় ধনের শক্তি বহুকায়ায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে অন্তর্ধান করবে এমন দিন এসেছে।' সেইসঙ্গে আরো বলছেন, আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে ধন উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই আমি কামনা করি। কারণ, এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না বলে মানবপ্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাটবে না।' সেই কারণেই জমিদারিতে তিনি ঐকত্রিক চাষ, অর্থাৎ সমবায়ের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের কাজে হাত দিয়েছিলেন, কৃষি ব্যাঙ্ক বসিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনোটাই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় নি। ঐকত্রিক চাষ সম্পর্কে তিনি বলছেন: "কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম। শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায়, খেতের পর খেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোরবেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো খেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এইরকম ভাগ-করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। চাষীদের ডেকে যখন

সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম তারা তখনই সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু বললে, আমরা নির্বোধ, এত বড়ো ব্যাপার করে তুলতে পারব কী করে? আমি যদি বলতে পারতুম 'এ ভার আমিই নেব' তা হলে তখনই মিটে যেতে পারত। কিন্তু আমার সাধ্য কী? এমন কাজের চালনাভার নেবার দায়িত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব— সে শিক্ষা, সে শক্তি আমার নেই।"

সমবায়নীতি সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের একই খেদ। তিনি তাই বলছেন: "আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সমবায় প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই ম্লান হয়ে আছে, মহাজনী গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোধিত আকারে বহন করছে। সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না।" তার কারণ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ ওয়াকিবহাল: "কো-অপারেটিভ যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলছে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশি কিছু এগোয় না। কেননা ধার দেওয়া, তার সুদ কষা এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের পক্ষেও সহজ কাজ, এমন-কি, ভীরু মনের পক্ষেই সহজ, তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে, তা হলে কোনো বিপদ নেই।"

সমবায় পদ্ধতিতে পতিসরেই তিনি বসান কৃষিব্যাঙ্ক। ১৯০৫ সালে। তিনি দেখলেন, মহাজনদের কাছ থেকে চাষীদের মুক্ত করতে না পারলে দেশের দুর্গতি দূর হবে না। কৃষি বা কুটিরশিল্পের জন্য যে টাকা দরকার তা তারা কোনোদিনই সংগ্রহ করতে পারবে না। চাষীদের অল্প সুদে টাকা দিতে তাই খোলা হল পতিসর কৃষিব্যাঙ্ক, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে। নোবেল প্রাইজে তিনি যে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পান তাও ঢালা হয় ব্যাঙ্কে। এই ব্যাঙ্কের টাকায় প্রজাদের দারুণ উপকার হয়। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই তারা মহাজনের দেনা শোধ করে দেয়। কালীগ্রাম থেকে মহাজনরা

ব্যাবসা গুটিয়ে অন্যত্র চলে যায়। এই ব্যাঙ্ক চলেছিল পুরো কুড়ি বছর। তার পর ফেল, রবীন্দ্রনাথ আরো ঋণগ্রস্ত।

ব্যাঙ্কের আগেই রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গী করে চালু করেন ব্যাবসা। ১৮৯৫ সালে। কুষ্টিয়ায় স্থাপিত হয় টেগোর অ্যাণ্ড কোং। এই ঠাকুর কোম্পানি চাষীদের ধান ও পাট কিনে বাজারে ছাড়ার দায়িত্ব নিল। আখ মাড়াই কলও তিনি বসান কুষ্টিয়ায়। কিন্তু ম্যানেজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যাওয়ায় এই কোম্পানিও ফেল পড়ল। রবীন্দ্রনাথ ব্যাবসা ছাড়লেন এবং আর-এক দফা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন— কমপক্ষে ৭০।৮০ হাজার টাকা দেনা।

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যু আর সুরেন্দ্রনাথের বীমা ব্যবসায়ে মনোযোগও ব্যাবসা ফেল পড়ার কারণ। কারণ একা রবীন্দ্রনাথ সব দিক সামলাতে পারছিলেন না। এই ব্যাবসা সম্পর্কে ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখেন: "সম্প্রতি কলকাতার একজন মারোয়াড়ী baler এবং তার সঙ্গে একজন ইংরাজ আমাদের সঙ্গে অর্দ্ধেক ভাগে আগামী বৎসর কাজ করতে চায়— যা কিছু খরিদ হবে তার অর্দ্ধেক খরচ আমাদের অর্দ্ধেক তাদের— তারা নিজব্যয়ে কলকাতার Establishment চালাবে আমরা নিজব্যয়ে কুষ্টিয়া চালাব— আমরা খরিদ করব তারা বিক্রি করবে··· এ বৎসর কালীগ্রামে ধানের কারবার সুবিধা নয় বলে আমরা তাতে হাত দিইনি— কেবল আখের কল পূর্ব্ববৎ চলচে।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই ব্যাবসা গুটিয়ে একজন কর্মীকে তা সামান্য খাজনায় দান করেন রবীন্দ্রনাথ। কর্মচারীটি পরে বিরাট ধনী হন।

কারবারে লোকসানের দায় এসে পড়াতে বন্ধু লোকেন পালিতের কাছ থেকে তিনি আবার ঋণ করলেন। মারোয়াড়ী মহাজনদের কাছ থেকেও ধার করেন। প্রিয়নাথ সেনকে জানিয়েছেন, তিন

বছরের মেয়াদে আট-পারসেণ্ট সুদে কুড়ি হাজার টাকার ধার পাওয়া গেলে তিনি লোকেন ও মারোয়াড়ীর ঋণ শোধ করতে পারবেন।

প্রিয়নাথ সেনকে লেখা আর-একটি চিঠির অংশ : "লোকেনের দেনা শুধতে যদি দেনা করি তাহলে লোকেন নিশ্চয়ই বিরক্ত হবে, সেই জন্যে আমি কাপিরাইট বেচতে প্রস্তুত হয়েচি। নিজের বই এবং নিজের দেহটা ছাড়া সম্প্রতি আর কিছু বিক্রেয় পদার্থ আমার আয়ত্তের মধ্যে নেই— বই কেনবার মহাজন পাওয়া দুর্লভ, এবং নিজেকে বিক্রয় করতে গেলেও খরিদ্দার পাওয়া যেত কি না সন্দেহ। কোন ছাপাখানাওয়ালা মহাজন যদি গ্রন্থাবলী কেনে তাহলে ঠকে না, এটা নিশ্চয়।"

টাকার জোগাড় হয় নি। টাকা লোকেন পালিতের ছিল না, ছিল বন্ধুর পিতা তারকনাথ পালিতের। সেই টাকা শোধ করেন ১৯১৭ সালে, তখনকার মালিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিয়ে।

সেরেস্তার কাজেও গোড়া থেকেই আধুনিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর সাক্ষ্যে অনেক তথ্য মেলে। বিরাট শ্রমসাপেক্ষ জমাওয়াশিল কাগজের বদলে কার্ড ইনডেক্স প্রথা তিনি প্রবর্তন করেন পুত্র রথীন্দ্রনাথের পরামর্শে। চাষীদের বেশির ভাগ ছিল মুসলমান। তারা বরাবর বরকন্দাজের কাজ করত। আমলার পদ ছিল হিন্দুদের একচেটিয়া। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন, এই ব্যবস্থায় মুসলমান প্রজারা মনে মনে ক্ষুব্ধ। ক্ষোভ দূর করতে রবীন্দ্রনাথ কিছু শিক্ষিত মুসলমানকে আমিন মুহুরি ও তহশিলদারের চাকরি দিলেন। এতে মুসলমানরা খুশি হলেন বটে, কিন্তু হিন্দু আমলারা গেলেন চটে।

হিন্দু আমলারা নানাভাবে অসহযোগিতা করায় রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকী রায়, ভূপেশ রায়,

চন্দ্রময় সান্যাল প্রমুখ শিক্ষিত যুবকদের আমলার কাজে নিয়োগ করেন। কালীমোহন ঘোষ ও অতুল সেনকে নিয়ে এসে গ্রাম-সংস্কারের দায়িত্ব দেন।

শচীন অধিকারী জানাচ্ছেন: "আমি...শিলাইদহ সদর কাছারিতে সহকারী মুন্সিরূপে জমিদারি কাজে শিক্ষানবিশী করি। আমাকে ম্যানেজারবাবু রবীন্দ্রনাথের আমলের পুরো নথিপত্র পড়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে উপদেশ দেন।...আমি স্বচক্ষে দেখেছি ১. একখানা খুব বড় মরক্কো চামড়ায় বাঁধা খাতায় জমিদারি ব্যবস্থার আদায় তহশিল জরিপ জমাবন্দী মামলা-মোকদ্দমা জমিজমা বন্দোবস্ত, হিসাবপত্র ও শাসন-সংরক্ষণাদি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী ছিল। পরবর্তীকালে ঐসব নিয়মাবলীর সংশোধন অথবা নূতন বিধির শ্লিপ যথাস্থানে আঁটা দেখি। আমি বুঝলাম কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ওয়ার্ডস ম্যানুয়েলের এ যেন একটা সংস্করণ জমিদারিতেও; ২. কোন্ সময়ে কোন্ নূতন ফসল চাষ করতে হবে, তার প্রকরণ কী, সার কী ইত্যাদি বিবরণ খুব সহজ ভাষায় ছাপিয়ে সার্কুলারের মতো মহালে বিলি করা হত। এমনি ছাপা সার্কুলার আমি দেখেছি; ৩. প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে জমিদারির আয়ব্যয়ের বরাদ্দ তৈরি হত ইংরেজি কায়দায়। তার মধ্যে জমিদারির আয়ব্যয়ের বিবরণ থাকত; ৪. প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই সদর মফস্বল সমস্ত কাছারির সর্বশ্রেণীর কর্মচারীর মাসিক বেতন (নতুন নিয়োগ), বেতন বৃদ্ধি, সদর মফস্বলে যাতায়াত, খোরাকির হার, বার্ষিক পার্বণীর বিবরণ স্বয়ং জমিদারের দ্বারা পাস করানো হত। পার্বণীর টাকা পুজোর ছুটিতে দেওয়া হত; ৫. জ্যৈষ্ঠর মধ্যে ঐ সমস্ত কাজ সেরে আষাঢ়ের কোন শুভদিনে সদর শুভ পুণ্যাহ অনুষ্ঠিত হত;... ৬. বার্ষিক কত মুনাফা, কত কিস্তিতে জমিদার বাড়িতে ইরসাল করতে হবে, মফস্বল ডিহিদারগণকে বারো মাসে কার কি বরাদ্দমতে টাকা সদরে ইরসাল করতে হবে, তার হিসাব থাকত; ৭. বৎসরে দুই বার

(আশ্বিন, চৈত্র) জমিদারির স্বাস্থ্য, জলবায়ু, ফসলের বিবরণাদি সম্বলিত আর্থিক অবস্থার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিপোর্ট দিতে হত। এই রকম রিপোর্ট আমরা কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এও একবার দিতাম। খাজনা সেলামি খাতের রেমিশন স্টেট্‌মেণ্ট পাঠানো হত; ৮. পেশকারবাবু প্রতি বছরের হিসাব পরীক্ষা করে কলিকাতা আপিসে রিপোর্ট পাঠাতেন। প্রত্যেক স্বত্বের মামলা দায়ের করার আগে মামলার বিবরণ পাঠিয়ে জমিদারের মঞ্জুরি নেওয়া হত; ৯. কর্মচারী নিয়োগ বরখাস্ত রিপোর্ট করে মঞ্জুরি নিতে হত; ১০. ম্যানেজারবাবুর কৃতকর্মের বা বিচারের বিরুদ্ধে প্রজাগণ জমিদারবাবুর নিকট আপিল করতে পারত ও বিচার হত।

পল্লী সংগঠনের অন্যান্য কর্মের সূত্রপাতও শিলাইদহে। লাঠি-খেলা ও শক্তিচর্চায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামবাসীদের উদ্‌বুদ্ধ করেন। মেছের সরদার নামে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একজন লাঠিয়ালের উপর ভার পড়ে শিলাইদহ গ্রামের ছেলেদের লাঠিখেলা শেখাবার। কাত্যায়নী-মেলা নাম দিয়ে তিনি স্থানীয় দেবী কাত্যায়নীর পূজা ও পনেরো দিনের মেলা চালু করেন ১৯০২ সালে। এখানেই স্বদেশী মেলার গোড়াপত্তন। রাখীবন্ধন উৎসবের সূত্রপাতও এইখানেই।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী ছিলেন অন্যতম কর্মী। তিনি জানাচ্ছেন: তাঁদের কর্মধারা ছিল প্রধানত তিনটি—১. হাতে-কলমে কৃষি-শিক্ষা; ২. আদর্শ গ্রাম তৈরি ও ৩. ব্রতী-বালক গঠন। বিদ্যালয় স্থাপন, শরীরচর্চা, জঙ্গল সাফ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ইত্যাদিও ছিল কর্মধারার অঙ্গ। তা ছাড়া গ্রামের মানচিত্র নদীনালা ইত্যাদির নকশাও তৈরি করতে হত। শিলাইদহ সংলগ্ন লাহিনী মৌজায় স্থাপন করা হয় আদর্শ গ্রাম। প্রস্তাবিত উপনিবেশের সঙ্গে রেলপথ ও নদীর ধারে বাজার বসিয়ে বিভিন্ন পল্লীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের একটা ছক তৈরি করেন রবীন্দ্রনাথ। গৃহস্থ চাকুরে চাষী তাঁতি কুমোর জেলের জন্যে আলাদা আলাদা প্লট। কিন্তু এই আদর্শ গ্রাম

নিয়ে বিবাদ বাধে নলডাঙার রাজাদের সঙ্গে, শুরু হয় মামলা। রেষারেষি এমন স্তরে পৌঁছয় যে, লাহিনী বাজারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের জমিদারি-কাজকর্ম সম্পর্কে পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথের জবানিতে জানা যায়, কুঠিবাড়িতে প্রতিদিন আমলারা রবীন্দ্রনাথের কাছে খাতাপত্র নিয়ে আসতেন। তবে আমলাদের কথায় চোখ বুজে কখনো কোনো চিঠি বা কাগজ সই করতেন না। সকালবেলায় হিসাব দেখা হয়ে গেলে আর চিঠিপত্র লেখা হলে প্রজাদের দরবার বসত। তারা আসত, কখনো নালিশ করতে, কখনো সুখদুঃখের কথা বলতে।

এই সুখ-দুঃখের কথা শুনতে রবীন্দ্রনাথ নিজে পায়ে হেঁটে গ্রামে বেড়াতে বেরোতেন। বরকন্দাজরা পিছু নিলে তাদের সরিয়ে দিতেন। তা ছাড়া বোটেই থাকুন, আর কুঠিবাড়িতেই থাকুন, যে কেউ যখন খুশি আসতে পারতেন তাঁর কাছে। কোনো নালিশ থাকলে প্রতিকারের ব্যবস্থাও করতেন। এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর।

সে সময় রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রাও ছিল সহজ। তখন তিনি পেতেন মাত্র দুশো টাকা মাসহারা। জমিদারির ভার নেওয়ার পর আরো একশো টাকা বাড়ে। ঐ টাকা দিয়েই মৃণালিনী দেবী সংসার চালাতেন, এমন-কি, রবীন্দ্রনাথের বই কেনার বিলও মেটাতেন। রথীন্দ্রনাথ বলছেন : সে সময় ঘোড়ায় চড়া মাছ ধরা নৌকো বাওয়া লাঠি-সড়কি খেলা সাঁতার কাটা ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের দারুণ উৎসাহ ছিল। রবীন্দ্রনাথই পুত্রকে সাঁতার শেখান। শিখিয়েছিলেন বোটের উপর থেকে নদীর জলে ফেলে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভালো সাঁতার জানতেন। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "গোরাই নদীর এপার ওপার করতে তাঁকে অনেকবার দেখেছি।"

তবে সব কাজের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় মণ্ডলীপ্রথার প্রবর্তন। এই প্রথাই রবীন্দ্রনাথকে বিপর্যস্ত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন

আমলা নায়েব ইত্যাদি নিয়ে কাছারিগুলিতে এলাহি ব্যাপার। তাঁর ছিল ৯টি ডিহি কাছারী এবং কৃষি ব্যাঙ্কের জন্য পৃথক সেরেস্তা। খরচ ও ঝামেলা কমাতে তিনি বিরাহিমপুর পরগনায় প্রথমে করলেন ৩টি বিভাগীয় কাছারি। তারই নাম মণ্ডলী। এর ফলে জমিদার শুধু খাজনা আদায়ের যন্ত্র রইলেন না, প্রজা-জমিদার-সমবায়ে গঠিত হল বলিষ্ঠ এক শক্তি। কিন্তু তাতে সবচেয়ে বিষণ্ণ ও বিরক্ত হলেন আমলারা। কারণ তাঁদের অপ্রতিহত প্রতাপ ও অবৈধ অর্থ আদায়ের সুযোগ চলে গেল। তাঁরা বিদ্রোহী হলেন। উপেক্ষিত প্রজারা অবশ্য আনন্দিত, কিন্তু নতুন ক্ষমতা হাতে পেয়েও তারা দ্বিধাগ্রস্ত। রবীন্দ্রনাথ তাদের অনেক বোঝালেন, আমলাদের দুরভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করলেন এবং চর মহালে নতুন ১টি বিভাগীয় কাছারি খুললেন। কিন্তু বাকি দুটিতে উপযুক্ত আমলার অভাব। কারণ অনেক ধূর্ত আমলা ইতিমধ্যে বিতাড়িত। জোতদাররা মনে করলেন, এটা বাবু-মশায়ের টাকা আদায়ের নতুন ফন্দি। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন আমলারা। রবীন্দ্রনাথ গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের বোঝালেন এবং আরো কিছু শিক্ষিত আমলা নিয়োগ করে আরো ২টি কাছারি খোলালেন এবং চাষীদের স্বমতে আনলেন। কালীগ্রামে এলেন অতুল সেন, শিলাইদহে কালীমোহন ঘোষ।

কালীমোহন ঘোষ সেকালের নামকরা একজন স্বদেশী। পূর্ব-বঙ্গের চাঁদপুরে বাড়ি, অসাধারণ বাগ্মী। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন শতশত যুবককে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা দিতে। তা ছাড়া তিনি ছিলেন রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন অনুরক্ত পাঠক। লোকচেনার পাকা জহুরী রবীন্দ্রনাথ কালীমোহনবাবুকে প্রথমে নিয়ে আসেন শিলাইদহে। একই সঙ্গে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়েও তিনি কর্মী নিযুক্ত হন। পরে যখন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হল, সেখানকার সকল উন্নয়নকর্মের প্রাণপুরুষ ছিলেন এই কালীমোহন ঘোষ। ১৯৪০ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি পল্লী-সংগঠনের মাধ্যমে মূঢ়

ম্লান মূক মানুষের সেবা করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। সেই স্নেহের সঙ্গে ছিল আস্থা। এমন জনপ্রিয় গ্রামকর্মী এদেশে কদাচিৎ জন্মগ্রহণ করেছেন।

কালীগ্রামের ভারপ্রাপ্ত কর্মী অতুল সেন ছিলেন বাগনানে একটি হাই ইস্কুলের হেডমাস্টার। তিনিও দীর্ঘকালের স্বদেশী। তার পর হঠাৎ তাঁর একটা-কিছু করার বাসনা হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ হল। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে কালীগ্রাম পরগনায় রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পল্লীমঙ্গলের কাজে এগিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের স্বদেশী সমাজকে বাস্তবে রূপ দেবার কাজে জীবনপণ করেছিলেন এই অতুল সেন আর কালীমোহন ঘোষ— দুজনেই ইংরেজের রোষে ঘরছাড়া ঘোর স্বদেশী। অতুল সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠিতে জমিদার রবীন্দ্রনাথের, কর্মী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। প্রথম চিঠিতে তিনি লিখছেন: "কালিগ্রামের কাজ সম্বন্ধে আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল— এমন কি রাত্রে ঘুম থেকে জেগে আমি ঐ কথা আলোচনা করে ঘুমতে পারি নি। তোমার চিঠি পেয়ে মনটা সুস্থ হল। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ নিয়ে এখানে এসেছি তাই কয়েক দিন নদীর উপরে থেকে একটু সুস্থ হয়ে নেবার চেষ্টায় আছি। এখানেও প্রজাদের নানা দরবার উপস্থিত হয়েছে তাই সমস্ত না সেরে নড়তে পারছি নে। কাজকর্মের প্রণালী সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে বসে মোকাবিলায় ঠিক করা যাবে।"

হিসাবপত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কত সাবধান ছিলেন, তার পরিচয় পাই ১৩২২ সালের ৬ মাঘ কলকাতা থেকে লেখা আর-একখানা চিঠিতে: "তোমাদের হিসাবের খাতা পরিষ্কার করিয়া রাখিয়ো অর্থাৎ যাহাতে কাজের অঙ্গ কোনোমতে অসম্পূর্ণ না হয় সেটার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিবে। তোমাদের হিসাব যখন audit হইবে তখন সকল-প্রকার ব্যয়ের voucher যেন থাকে এবং মোটা মোটা খরচ সম্বন্ধে

সুরেনের হুকুম আদায় করিয়া রাখিয়ো— হিসাব সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি রাখিলে সেই ছিদ্র দিয়া নৌকাডুবি হইতে পারে। আসল কাজটা যে তোমরা করিয়া তুলিবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহমাত্র নাই। আজ অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।”

কিভাবে কী মনোভাব নিয়ে গ্রামের কাজ করতে হবে সেই সম্পর্কে ১৩২২ সালের ২১ ফাল্গুন শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় চিঠি :

“সমস্ত হৃদয়মন উৎসর্গ করিয়া লোকের হৃদয় অধিকার করিয়া লও, তাহা হইলেই সমস্ত বাধা কাটিয়া যাইবে। টাকা সম্বন্ধে তখনি মনে খটকা বাধিবে যখনি মন বিমুখ হইবে। অবশ্যকর্তব্য সাধন করিতে বসিলে সকলের মন পাওয়া যায় না এবং মন যোগাইবার দিকেই দৃষ্টি রাখিলেও চলিবে না, কিন্তু ওখানকার লোকদের স্পষ্ট বুঝিতে পারা দরকার হইবে যে তুমি অক্ষুন্ন শ্রদ্ধার যোগ্য, তাহাদের সেবায় তোমার পরিপূর্ণ শক্তি পরিপূর্ণ আনন্দে কাজ করিতেছে। তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত ছোট কথা সুদূরে চলিয়া যাইবে। অতএব কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও, একদিন তোমার পূর্ণ আসন তুমি অধিকার করিয়া বসিতে পারিবে।”

কাজের ধারা সম্পর্কে অতুল সেনকেই লেখা আর-একখানা চিঠি :

“তোমাদের কাজ যেরূপ চলিতেছে তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। সাধারণের হিতের জন্য প্রত্যেককে নিজের সামর্থ্যে খাটাইবার অভ্যাসটি যদি কোনোমতে পাকা হইয়া যায় তাহা হইলেই তোমার সকল চেষ্টার সার্থকতা হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একবার কোথাও ইহার শুরু হইলেই ইহা দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িবে।

“আমার একটি কথা বলিবার আছে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে একটি আনন্দের সুর বাজাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের গ্রামের

জীবনযাত্রা বড়োই নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণের শুষ্কতা দূর করা চাই। হিতানুষ্ঠানগুলিকে যথাসম্ভব উৎসবে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়ো। বৎসরে একদিন বৃক্ষরোপণের উৎসব করিবে। বৈশাখের শেষে কোনো একদিন ইস্কুলের ছুটি দিয়া সব ছেলেদের লইয়া বনভোজন ও বৃক্ষরোপণ করিবার আয়োজন করিলে ভাল হয়। রাস্তা প্রভৃতির কাজ আরম্ভ করিবার প্রথম দিনটায় একটু উৎসবের ভাব থাকিলে এগুলো ধর্মকর্মের চেহারা পাইবে। আর একটি কথা মনে রাখা চাই। চাষী গৃহস্থদের মনে ফুলগাছের সখ প্রবর্তন করিতে পারিলে উপকার হইবে। প্রত্যেক কুটীরের আঙিনায় দুই চারিটি বেলফুল গোলাপ ফুলের গাছ লাগাইতে পারিলে গ্রামগুলি সুন্দর হইয়া উঠিবে। দেশে এই সৌন্দর্যের চর্চা অত্যাবশ্যক এ কথা ভুলিলে চলিবে না।

"বিচালিভরা যে মাদুরের নমুনা পাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে বিচালি আরো ঘন করিয়া ঠাসিয়া দেওয়া দরকার— নহিলে বসিতে বসিতে মাঝে মাঝে গর্ত হইয়া যাইবে।

"ম্যানেজার আমাকে আরো কিছু কাঁথা আলপনা প্রভৃতি পরে পাঠাইবেন আশা দিয়াছিলেন— সে আশা যদিচ কালক্রমে দুর্বল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখনো মরে নাই সে কথা তাঁহাকে জানাইবে। ওখানে বাখারির চাঙারি চুপড়ি প্রভৃতি বিশেষ কোনো দ্রব্য বা মাটির কোনো পাত্র যদি পাও তবে পাঠাইয়া দিয়ো। কুঁড়ে-ঘরের নমুনা পাঠাইবার কথা ছিল ম্যানেজারবাবুর তাহা মনে নাই কিন্তু আমার মনে আছে।"

কালীগ্রাম পরগনার ভারপ্রাপ্ত কর্মী অতুল সেনের কাজকর্মে রবীন্দ্রনাথ খুশি। তাঁকে লেখেন: "এই তো চাই। এমনি করিয়া এক জায়গায় কাজ আরম্ভ হইলে সব জায়গাতেই হইবে। এই বৎসর প্রজারা প্রচুর ফসল পাইয়াছে বলিয়া স্ফূর্তিতে আছে— এখনি তোমার কাজের আসর জমিবে ভাল।" কিন্তু এই প্রসন্ন পরিবেশের

মধ্যে হঠাৎ চলে এল দুর্যোগের ঘনঘটা। অতুল সেন অন্যান্য প্রায় সব কর্মী সহ অন্তরায়িত হলেন ইংরেজদের রোষে। কাজে ভাঁটা পড়ল।

অতুল সেনকে লেখা চিঠির সঙ্গে ১৩২২ সালের ১৩ মাঘ তারিখে লেখা আর-একখানি চিঠি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। চিঠিখানা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র মনোরঞ্জন চৌধুরীকে লেখা :

"পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র্য অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে, নিজের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করে, এই আমার অভিপ্রায়। প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি— আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায় তাহাতে বৎসরে ১১০০০৲ টাকার আয় দাঁড়াইয়াছে। এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু অপব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খলতা যথেষ্ট আছে। এইজন্য কিছুদিন হইল আমি নিজে গিয়া সকলকে ডাকিয়া নূতন নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া আসিয়াছি। এখন যিনি অধ্যক্ষ তাঁহার সঙ্গে কর্মচারীদের খিটিমিটি হওয়াতে কর্মচারীরা প্রজাদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে, এ সময়ে আমি যদি অতি শীঘ্র না যাই তবে অনুতাপ করিতে হইবে। ইহার উপরে গ্রামে ওলাউঠা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে— আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে তাহার ভালরূপ প্রতিকার হইতে পারিবে। এমন অবস্থায় আমি কাহার খাতিরে একদিনও যদি বিলম্ব করি তবে অপরাধ হইবে।"

চিঠিগুলিতে গ্রাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনের কথা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। তিনি কী চান, তাও জানা গেছে। তা ছাড়া আর একটি জিনিস বোঝা গেল, রবীন্দ্রনাথ যেমন শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে নীরস পড়াশোনাকে সরস করে তুলতে দৈনন্দিন জীবনে

আনন্দের সুর জাগাতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন উৎসবের ভিতর দিয়ে সকলকে সম্মিলিত করতে, ঠিক তেমনি গ্রামোন্নয়ন-কর্মের ভিতরও প্রাণের শুষ্কতা দূর করতে এবং কাজের সঙ্গে আনন্দ যুক্ত করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু সে যাই হোক, দেশব্রতী একনিষ্ঠ কর্মীদের নিয়োগ করা সত্ত্বেও জমিদারিতে সংঘাত থামে নি। মণ্ডলীপ্রথার বিরুদ্ধে অনেকেই সংঘবদ্ধ হল।

ম্যানেজার বিপিনবিহারী বিশ্বাস চাকরি ছেড়ে দেন। বিপন্ন পিতার সাহায্যে এগিয়ে আসেন রথীন্দ্রনাথ। কিছুদিন ম্যানেজারি করে পালালেন এডওয়ার্ড সাহেব, পরে ম্যানেজিং এজেণ্ট হয়ে আসেন জামাতা প্রমথ চৌধুরী।

মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ একদিকে আমলাতন্ত্রের একাধিপত্য হটালেন, অন্য দিকে চাষীদের আর্থিক অবস্থা দূর করতে বিশ্বস্ত আমলাদের নানা নির্দেশ দিতে লাগলেন। 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে তিনি এই সম্পর্কে লিখছেন: "আমাদের জমিদারির মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগনাকে পাঁচটা মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লীসমাজ-স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে— পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্ব-প্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়, তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে— হিন্দু পল্লীতে বাধার অন্ত নেই।"

এই ব্যবস্থা চালু হয় ১৯০৮ সালে। বিরাহিমপুর পরগনায় পাঁচটি মণ্ডলী হল এইভাবে: ১. শিলাইদহ: নায়েব বিপিনবিহারী

বিশ্বাস, ২. জানিপুর-বনগ্রাম: নায়েব নলিনী চক্রবর্তী, ৩. কুমারখালি-পান্টি: নায়েব ভূপেশচন্দ্র রায়, ৪. কয়া-কালোয়া: নায়েব রতিকান্ত দাস, ৫. সদিরাজপুর-রাধাকান্তপুর: নায়েব সতীশচন্দ্র ঘোষ। প্রতি মণ্ডলীতে নায়েব বাদে চারজন প্রজা সভ্য—দুজন হিন্দু, দুজন মুসলমান। এঁরাই প্রতি সপ্তাহে একবার সভা করে সব ব্যবস্থা নিতেন। ফলে শিলাইদহ সদর কাছারির গুরুত্ব কমে গেল।

একই ব্যবস্থা চালু হল কালীগ্রাম পরগনায় তিনটি মণ্ডলীতে ভাগ করে এবং গোটা জমিদারির চেহারা গেল পালটে। বড়ো বড়ো রাস্তা হল, গোপীনাথ মন্দির ও খোরশেদ ফকিরের দরগার সংস্কার হল, দাতব্য চিকিৎসালয়, জানিপুরের বিরাট গঞ্জ পান্টির সুতাহাটা-গোহাটা জেঁকে বসল, ঘরে ঘরে তাঁত চালু হল, মক্তব মাদ্রাসা স্কুল টোল বসল। কিন্তু অসন্তোষের দানা বাঁধল ভিতরে ভিতরে। আমলারা তলে তলে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন জমিদারের বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলীপ্রথা ও জমিদারি পরিচালনা নিয়ে অন্যতম মণ্ডলী-ম্যানেজার সতীশচন্দ্র ঘোষকে ১৯০৮ সালে যে তিনখানি চিঠি লেখেন, তা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। চিঠিগুলিতে রবীন্দ্র-নাথের মনের ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ১৩১৫ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ তিনি লিখছেন:

"ডাক নজর অনুসারে জলির নজরখাজনা আদায়ের বৎসর এ নহে। প্রজাদের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আদায়-তহশিল করা শ্রেয়। এ সম্বন্ধে ম্যানেজারকে পত্র লিখিয়াছি। তুমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কিরূপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য আমাকে জানাইবে।

"সর্বতোভাবে প্রজাদের সহিত ধর্মসম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে হইবে। আমরা যে সর্বপ্রকারে প্রজাদের হিত ইচ্ছা করি, তোমাদের ব্যবহারে তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

তোমার অধীনস্থ মণ্ডলের অন্তর্গত পল্লীগুলির যাহাতে সর্বপ্রকারে উন্নতিসাধন হয় প্রজাদিগকে সেজন্য সর্বদাই সচেষ্ট করিয়া দিবে। নূতন ফসলের প্রবর্তনের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিবে। ইতিপূর্বে তোমাদের প্রতি যে-মুদ্রিত উপদেশ বিতরণ হইয়াছে, তদনুসারে কাজ করিতে থাকিবে।

"প্রজাদের প্রতি যেমন ন্যায় ধর্ম ও দয়া রক্ষা করিবে, তেমনি অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে বিশেষভাবে কর্মের শাসনে সংযত করিয়া রাখিবে। কর্মচারীদের কোনো প্রকার শৈথিল্য বা নিয়মভঙ্গ আমি কখনোই মার্জনা করিব না। যাহাতে তোমার অধীনস্থ তোমার আমলাগণ প্রশ্রয় পাইতে না পায়, এ সম্বন্ধে তোমাকে অত্যন্ত কঠিন হইতে হইবে। তুমি স্বয়ং যেরূপ অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত কাজ করিবে, তাহাদের নিকট হইতেও তেমনি করিয়া বিনা ওজরে কাজ পুরাপুরি আদায় করিয়া লইবে। কর্মচারিগণ সম্পূর্ণ মনে প্রাণপণ পরিশ্রমে কাজ করিতেছে জানিতে পারিলে তাহারা পুরস্কৃত হইবে।"

দ্বিতীয় চিঠি ১৩১৫ সালের ২ আষাঢ় লেখা। বক্তব্য বিষয় একই, কর্তব্যে কঠোর, আর প্রজাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হওয়া চাই :

"তুমি তোমার কর্তব্য পালন করিতে কিছুমাত্র সংকোচ করিবে না। যাহাতে প্রজাদের হিতকার্য করা হয় এই দিকে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে। আদায় তহশিলের কার্যে যদি অতিরিক্ত লোকের আবশ্যক হয় তবে রিপোর্টের দ্বারা আমাকে জানাইলেই তাহার প্রতিকার হইবে। তোমার বেতনের যে অংশ কাটা গিয়াছে এবারকার মতো তাহা মাপ করিয়া দেওয়া হইবে।

"শরৎ সরকারকে মণ্ডলীর সেরেস্তা গঠনের জন্য পাঠানো গিয়াছে। যেভাবে কাজ করিতে হইবে শরৎ তাহার উপদেশ দিবে এবং কার্যনির্বাহের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক সে সম্বন্ধে সে রিপোর্ট করিবে। যাহাতে জমা সুমার ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল কর্মই মফস্বল সেরেস্তায় সম্পন্ন হইতে পারে, সেইরকম বন্দোবস্ত করিবে।"

তৃতীয় চিঠিতেও একই উপদেশ। চিঠিখানি ১৩১৫ সালের ১৯ শ্রাবণ লেখা :

"তোমার সাধ্যমতো এবং উচিতমতো কাজ করিবে। শৈথিল্যও করিবে না, অন্যায়ও হইতে দিবে না। ইহাতে অসন্তোষের কোনো আশঙ্কা করিও না। উজির ও ছাবের বরকন্দাজদিগকে যেরূপ শাস্তি দিয়াছ, এবার তাহাদের শিক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে এরূপ ঘটিলে তাহাদিগকে বরখাস্ত করা কর্তব্য হইবে।

"যদি খয়রাতুল্লাকে কালীগ্রামে আনিয়া কালোয়া মণ্ডলীকে অন্যান্য মণ্ডলীর মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তবে তোমার অংশে কালোয়া ও রঘুনাথপুর লইতে পারিবে কিনা লিখিবে। এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কেহ যেন কিছু না জানিতে পারে।"

জানকী রায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত ম্যানেজার। এমনিতে কড়া, কিন্তু দয়াশীল। তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনে নামেন এবং বহু অত্যাচারিত নমঃশূদ্রকে ঢাকা থেকে এনে জমিদারিতে বসান। তা ছাড়া তিনি ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। জমিদারির বহু কঠিন সমস্যা তিনি বুদ্ধিবলে সমাধান করেছেন। সংস্কার চেষ্টায় জানকী-বাবুর সহযোগী ছিলেন ভূপেশ রায়, শান্তিনিকেতনের সতীশ রায়ের ভাই। ঐ ন্যায়নিষ্ঠ কর্মচারীকে লেখা আরো কয়েকখানি চিঠিতে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে সম্পর্ক কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। ১৩১৫ সালের ২৯ চৈত্র জানকীবাবুকে তিনি লিখছেন :

"আমি জমিদারিকে কেবল নিজের লাভ-লোকসানের দিক হইতে দেখিতে পারি না। অনেকগুলি লোকের মঙ্গল আমাদের প্রতি নির্ভর করে। ইহাদের প্রতি কর্তব্যপালনের দ্বারা ধর্মরক্ষা করিতে হইবে। এ পর্যন্ত যে সকল কর্মচারী ছিলেন তাঁহারা অনেকে কর্মপটু ছিলেন কিন্তু সকলেই আমাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়াছেন। তোমাদিগকে লইয়া আমি যে একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহার মূল উদ্দেশ্যই

আমাদের যথার্থ কর্তব্যসাধন করা। তোমরা সকলে মিলিয়া সেই উদ্দেশ্যকে রক্ষা করিবে। তোমাদের কর্ম ধর্মকর্ম হইয়া উঠিবে এবং তাহার পুণ্য তোমরা এবং আমরা লাভ করিব।... তোমাদের চরিত্রে ব্যবহারে ও কর্মপ্রণালীতে আমাদের জমিদারি যেন সকল দিক হইতে ধর্মরাজ্য হইয়া উঠে। আমাদের লাভই কেবল দেখিবে না, সকলের মঙ্গল দেখিবে।"

জানকীবাবু যখন জমিদারির ম্যানেজার ছিলেন, তখন শিলাইদহের সদর কাছারিতে আমলা-মহলে বিদ্রোহ চলছিল। সম্পন্ন প্রজাদের নিয়ে দলাদলিও সৃষ্টি হয়। জানকীবাবু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। সত্য-কুমার মজুমদার ছিলেন সদর কাছারির সেক্রেটারি, তাঁর সঙ্গে জানকীবাবুর মনান্তর ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ১৩১৫ সালের ২৪ ফাল্গুন এক চিঠিতে লেখেন :

"সত্যকুমার সম্বন্ধে তোমরা ভুল ধারণা করিতেছ বলিয়া আমার বিশ্বাস। তোমার কোনো কাজের বিরুদ্ধে সত্যকুমার চক্রান্ত করিয়াছে বলিয়া যদি তোমার প্রত্যয় হয় তবে তাহা অমূলক। যদি সমূলকও হয় তবু নিজের মনে কোনো ক্ষুদ্রতা রাখিও না।... আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি বলিয়াই এরূপ পত্র লিখিতে পারিলাম। তোমার চিত্ত নির্বিকার থাকে ইহাই দেখিতে আমার আনন্দ।"

চিঠিগুলিতে প্রমাণ : প্রজাদের মধ্যে 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠায় অভিলাষী রবীন্দ্রনাথ নিজের লাভ-লোকসানের কথা চিন্তা না করে শুধু প্রজাদের মঙ্গল সাধনে কৃতসংকল্প। শুধু তাই নয়, অসৎ আমলাদের শাস্তিদানেও তিনি বদ্ধপরিকর। তবে তিনি যে অনেক সময় সব অন্যায় জেনেও কাউকে কাউকে ক্ষমা করেছেন, তার দৃষ্টান্তও আছে।

জমিদারি পরিচালনাকালে রবীন্দ্রনাথ বহু মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। নথিপত্র নিয়ে কৃষ্ণনগরের আদালত এবং কলকাতার হাইকোর্টে তিনি কম ছোটাছুটি করেন নি। আইনের চুলচেরা

বিশ্লেষণে তিনি নিজেই পারদর্শী হয়ে ওঠেন। চিত্তরঞ্জন দাশ একবার বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ উকিল হলে আমাদের হারিয়ে দিতেন।' রবীন্দ্রনাথ দেওয়ানি মকদ্দমা ভালো বুঝতেন। বলতেন, মামলা জিনিসটাই খারাপ, তবে দেওয়ানি বুদ্ধি ও কৌশলের খেলা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য। ফৌজদারি মামলা হলে রেগে যেতেন। কোনো প্রজা স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁর নামে মামলা করলে অবশ্য বিরক্ত হতেন না। প্রতিপক্ষকে জব্দ করার জন্য তিনি নিজেও যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, কিন্তু জয়ের পর তিনি ক্ষমাশীল। এই ক্ষমাশীলতার অন্যতম দৃষ্টান্ত সেরকান্দির বাজার নিয়ে মামলা। একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে কুমারখালির ধনী ব্যবসায়ী ফটিক মজুমদার। মামলাটা জিদের এবং টাকার শ্রাদ্ধও তদনুরূপ। পত্তনিদার ফটিক মজুমদারের কাছ থেকে পত্তনি খাজনা আদায় নিয়েই এই জিদের মামলা। ফটিক ধনী, কিন্তু ঠাকুরবাবুদেরই প্রজা। নিম্ন আদালতে ফটিক জয়ী হলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দমলেন না, আপিল করলেন হাইকোর্টে। উকিল দিলেন রাসবিহারী ঘোষকে। উকিল তো রইলেনই, কিন্তু কার্যত মামলা পরিচালনা করলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে, বড়ো উকিলেরও বাড়া। সব নখদর্পণে। পরাজয় জেনে ফটিক মজুমদার জোড়াসাঁকোয় এলেন মিটমাট করতে। রবীন্দ্রনাথ রাজি নন। তবে শেষে জয়ের পর মামলার খরচের কয়েক হাজার টাকা মাফ করে দিলেন নিজ ঔদার্যগুণে। ফটিক মজুমদার তার বদলে প্রতিশ্রুতি দিলেন সেরকান্দি বাজারের উন্নয়নে তিনি রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হবেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষাও করেছিলেন।

নলডাঙার রাজাদের সঙ্গে এবং কুঠিবাড়ির সংলগ্ন একটি আম-বাগানের স্বত্ব নিয়েও দীর্ঘদিন মামলা চলেছে স্থানীয় অধিকারীবাবুদের সঙ্গে। আর-একটি বিখ্যাত মামলা তেরো ছটাকের মামলা। রবীন্দ্র-নাথ ও নড়াইলের প্রতাপান্বিত জমিদার উভয়ের জমিদারির সীমানাগত ঐ তেরো ছটাক জমির জন্য বহুদিন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা

চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ জয়ী হন এবং দুই জমিদারের মিটমাট হয়ে যায়। ঐ মামলায় দ্বারিকানাথ বিশ্বাস নামে এক ভদ্রলোক তদারক নিযুক্ত হন। মামলা চালাবার সময় তিনি অন্যায় অনেক কাজ করেছিলেন এবং গোপনে নিজের জন্য অনেক জমিজমা করে নেন। মামলা শেষ হয়ে গেলে ম্যানেজার জানকীবাবু দ্বারিক বিশ্বাসকে শাস্তি দিতে চান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ক্ষমা করেন। সেই সময়কার দুখানি চিঠি উল্লেখযোগ্য। প্রথমখানি জানকী রায় ও দ্বিতীয় খানি ভূপেশ রায়কে লেখা। চিঠি দুটিতে প্রজানুরঞ্জক রবীন্দ্রনাথের আর-একটি দিক দেখা যায়:

"কর্মের নিয়ম অনুসারে দ্বারিক বিশ্বাসকে যেভাবে চালনা করিতে হইবে তাহা দৃঢ়ভাবেই স্থির করা আবশ্যক। সে সম্বন্ধে আমি কোনো শৈথিল্য করিতে বলি না। আমি কেবলমাত্র বলি তাহার প্রতি রাগ করিয়া কোনো কাজ না করা হয়। স্বার্থরক্ষার জন্য প্রবল ব্যক্তি স্বভাবত চাতুরি অবলম্বন করিয়া থাকে। সে স্থানে দুর্বল পক্ষের বেলায় চাতুরি দেখা গেলে আমরা যে রাগ করি সে চাতুরির প্রতি রাগ নহে, দুর্বলের প্রতিই রাগ। কারণ এই দ্বারিক বিশ্বাসই চতুরতার দ্বারা আমাদের কোনো কাজ উদ্ধার করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের পাত্র হয়। এমন স্থলে নিজের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে চাতুরি প্রয়োগ দেখিলে আমাদের রাগ করিবার কারণ নাই। আমার প্রজারা নিজের বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার জন্য যখন চতুরতা করে, আমার মনে তখন রাগ হয় না। তাহাদের বেদনা ও ব্যাকুলতা বুঝিবার আমি চেষ্টা করি।

"দ্বারিক বিশ্বাসকে আমি তোমার কাছেই ফিরাইয়া দিব, নিজে কোনো হুকুম দিব না। তোমরা যেটা কর্তব্যবোধ করিবে তাহাই করিবে। কেবলমাত্র দণ্ড দিবার জন্য কিছুই করিবে না। দ্বারিক বিশ্বাস যদি প্রবল হইত তবে সে আমাকে দণ্ড দিবার চেষ্টা করিত। আমি দৈবক্রমে প্রবল হইয়াছি বলিয়াই যে ক্রোধ পরিতৃপ্তির জন্য

তাহাকে দণ্ড দিব এবং সে তাহা অগত্যা বহন করিবে এ আমি সংগত মনে করি না। ইতি ১৮ আষাঢ় ১৩১৩।"

জমিদারির শৃঙ্খলা রাখতে জানকীবাবু রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ সত্ত্বেও দ্বারিক বিশ্বাসকে কর্মচ্যুত করে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি দ্বারিক বিশ্বাসের প্রতি ছিল। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ দেখলেন ছলচাতুরি করে যে লোক তাঁকে মামলায় জিতিয়েছে, সে যদি একই পন্থায় নিজে সম্পত্তি করে, তা হলে দ্বিতীয়টি অন্যায় হলে প্রথমটিও অন্যায়। কিন্তু তা না করে প্রথম কাজের জন্য দ্বারিক বিশ্বাস প্রশংসার পাত্র হয়েছে। তা হলে দ্বিতীয়টির জন্যই বা শাস্তি কেন? ভূপেশ রায়কে ১৩১৫ সালের ৮ ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:

"দ্বারিক বিশ্বাসের জোত পাঁচশত টাকায় অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছ, ইহাতে আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। কারণ আমি দ্বারিককে নিজের মুখে আশ্বাস দিয়াছিলাম যে, তুমি এই জোত ইস্তাফা দিলে জোত হইতেই আমাদের দেনার টাকা বন্দোবস্ত নজর ইত্যাদি দ্বারা উদ্ধার করিয়া তোমারই সহিত বন্দোবস্ত করিব। তোমার বিনা এতেলায় স্বেচ্ছামত কুণ্ডদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাতে আমার পক্ষে একান্ত লজ্জার কারণ ঘটাইয়াছ। আমি এরূপ আশা করি নাই।"

এই পত্রে কাজ হয়। দ্বারিক বিশ্বাস ঠাকুরবাবুদের দেনা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পান এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকেন।

প্রজাদের ক্ষমা ও অসৎ আমলাকে আমল না দেওয়ার আর একটি নিদর্শন পাওয়া গেল কলকাতা থেকে শিলাইদহের ম্যানেজারকে ১৯১৫ সালে লিখিত একটি চিঠিতে:

"কুঠিবাড়িতে কোনোমতেই দুশ্চরিত্র লোক রাখা চলিতে পারিবে না। অতএব··· এ কার্যে নিযুক্ত করিয়ো না। ওখানকার লোকেদের

কথা চিন্তা করিয়া দেখিব। আপাতত বাছের ও মালীকে দিয়া গাছ কাটানো ও চারিদিকের জঙ্গল সাফ করানোর কাজ করাইতে থাকিবে। জিনিষপত্র ঠিকমত রাখার জন্য বাছেরই এখনকার মত দায়িক রহিল।

"আমার একটা টেবিল দেখিলাম গাড়িতে তুলিয়া দেওয়া হয় নাই— তাহার কি দশা হইল ও তাহা কবে পাওয়া যাইবে জানিতে ইচ্ছা করি।

"মহিম সরকারকে কালোয়ায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমি তাহাকে গোপালের অধীনে সদরে খাজাঞ্চি সেরেস্তায় নিযুক্ত করিতে চাই। এখানে বিশ্বাসী কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। উহার স্থানে মৈজদ্দি মোল্লাকে রাখিলে যদি ক্ষতি বোধ না কর তবে রাখিতে পার। সে আমাদের প্রজা অতএব তাহাকে ক্ষমা করিয়া chance দেওয়া অকর্ত্তব্য নহে, কিন্তু বিদেশী লোক সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা নহে। ইতি ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২২।"

এই প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি থেকে কিছু জবানবন্দিও উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলছেন: "১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে তখনকার দেশনেতারা কলকাতা এবং বড়ো বড়ো শহরেই এই আন্দোলন নিয়ে মেতে রইলেন— কিন্তু তখন বাংলাদেশের গ্রামবাসীদের কথাই বাবার বেশি করে মনে হতে লাগল। তিনি অনুভব করলেন কেবল আন্দোলন করলেই হবে না, ভিত থেকে কাজ শুরু করার সময় হয়েছে। এই সময় পাবনা কনফারেন্সে তাঁকে যখন ডাকা হল, এই কথাই তিনি দেশবাসীকে জানালেন তাঁর ভাষণে। কেউ যখন কিছু করলেন না তখন তিনি নিজে তাঁর ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু করতে পারেন সেই কাজে নেমে গেলেন। বিরাহিমপুর ও কালাগ্রাম— এই দুই পরগনা তাঁর হাতে ছিল— তিনি সেখানকার গ্রামবাসীদের দুরবস্থা ঘোচাবার জন্য একটা প্ল্যান করলেন। বিচারের ব্যবস্থা, আগে থেকেই ছিল। মহাজনের হাত থেকে তাদের উদ্ধার

করা, চাষের উন্নতি করা, ঘরে ঘরে ছোটোখাটো শিল্প প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি গ্রামোন্নতির নানা দিকে চেষ্টা যাতে হয় তার ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করলেন। বাইরে থেকে অজস্র টাকা ঢেলে কোনো কাজই করা যাবে না, গ্রামবাসী নিজেদের চেষ্টাতেই নিজেদের অবস্থার উন্নতি করবে, এইটেই ছিল বাবার উদ্দেশ্য। শান্তিনিকেতন থেকে [সত্যেশ্বর নাগ, বঙ্কিমচন্দ্র রায় ও] কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতিকে পতিসরে নিয়ে এলেন। কাজ আরম্ভ করে দেখলেন পতিসরেই উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া যাবে— শিলাইদহের আশেপাশে প্রজাদের মধ্যে তেমন ঐক্যবন্ধন ছিল না। কালীমোহনবাবুকে শান্তিনিকেতনে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ল বলে তাঁকে শীঘ্রই ফিরে যেতে হয়েছিল, কিন্তু অন্যেরা অনেকদিন পর্যন্ত পতিসরে গ্রামোন্নতির কাজে লিপ্ত ছিলেন।

"কালীগ্রাম পরগনাকে কাজের সুবিধার জন্য তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হল। পল্লী সংগঠনের কাজ একটি সাধারণ সভার হাতে ন্যস্ত করা হল। প্রজারা স্বেচ্ছায় একটা কর দিতে রাজি হল। খাজনা আদায়ের সময় প্রতি টাকায় এক আনা করে সকল প্রজাই দিত, সেই টাকা সাধারণ ফাণ্ডে জমা হত। এই উপায়ে ফাণ্ডের যা আয় হত সাধারণ সভা বাজেট করে স্থির করত সেই টাকা কিভাবে খরচ করা হবে। একে একে প্রত্যেক গ্রামে অবৈতনিক পাঠশালা খোলা হল, আর পতিসরে স্থাপিত হল একটি মাইনর ইস্কুল— পরে সেটা হাইস্কুলে পরিণত হয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা ব্যয়সাপেক্ষ বলে পতিসরেই কেবল চিকিৎসালয় স্থাপন সম্ভব হল। পরে তিন বিভাগে তিনজন ডাক্তার বসানো হয়েছিল। গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নতি হতে থাকল, পানীয় জলের ব্যবস্থা হল। বয়নশিল্প শেখানোর জন্য শ্রীরামপুর থেকে একজন ভালো তাঁতিকে নিয়ে যাওয়া হল। প্রজাদের উৎসাহ যেমন বাড়ল, এই-সব কাজেরও দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। কিছুদিন পর বাবা দেখলেন প্রজাদের সাধারণ সভা

একটি কাজ করতে অসমর্থ— সে হচ্ছে মহাজনের ঋণ থেকে তাদের মুক্ত করা। ঋণমুক্ত না হলে তারা কোনো বিষয়েই উন্নতি করতে পারবে না। কৃষির বা শিল্পের জন্য যেটুকু মূলধন দরকার তা তাদের হাতে কখনো থাকবে না। এইজন্য বাবা নিজেই পতিসরে একটি ব্যাঙ্ক খুললেন। কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হল। পরে বাবা যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন এক লাখের উপর, সব টাকাটাই এই কৃষিব্যাঙ্কের কাজে দিলেন। ব্যাঙ্ক যা সুদ দিত বহু বছর ধরে সেটা শান্তিনিকেতন ইস্কুলের একটা প্রধান আয় ছিল। কৃষিব্যাঙ্ক হয়ে প্রজাদের খুব উপকার হল। কয়েক বছরের মধ্যেই তারা মহাজনদের দেনা সম্পূর্ণ শোধ করে দিতে পেরেছিল। কালীগ্রাম এলাকা থেকে মহাজনরা তাদের ব্যাবসা গুটিয়ে নিয়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছিল।”

রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে আরো জানাচ্ছেন :

“কালীগ্রামে গ্রামসংস্কার-প্রতিষ্ঠানের গঠন এইভাবে করা হয়— প্রত্যেক গ্রামের বাসিন্দারা সেই গ্রামেরই একজন প্রবীণকে প্রধান বলে নির্বাচিত করে। প্রতি বিভাগে যতগুলি প্রধান নির্বাচিত হয় তাদের সকলকে নিয়েই বিভাগীয় হিতৈষী সভা গঠিত। তিন বিভাগের প্রধানরা মিলে পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার সভ্য নির্বাচন করে। তাদের বলা হয় পরগনার পঞ্চপ্রধান। এই পাঁচজন ছাড়াও কেন্দ্রীয় সভায় জমিদারের একজন প্রতিনিধি থাকে।… সাধারণত বছরে একবার কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার মিটিং হয়। এত কাজ থাকে যে সমস্ত দিন সভা করেও অনেক কাজ শেষ হয় না। প্রথমত গত বছরের হিসাব পরীক্ষা করা হয়, যে টাকা ব্যয় হয়েছে তাতে কী কাজ কতখানি হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়। তার পর আগামী বছরের জন্য কাজের প্রোগ্রাম স্থির করা ও সেই অনুযায়ী খরচের বাজেট প্রস্তুত করা। বার্ষিক সভায় এই দুটি হল প্রধান কাজ। আর-একটি কাজ ছিল জমিদারি পরিচালনায় কর্মচারীদের

কোনো ত্রুটি বা প্রজাদের প্রতি অত্যাচার ঘটলে জমিদার মহাশয়কে সে বিষয় জানানো।”

তা ছাড়া ১৩৪৬ সালে শ্রীনিকেতনের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি পরিচালনা এবং তৎকালীন পল্লীসমাজের চমৎকার একটি বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন :

“আমি শহরের মানুষ, শহরে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষেরা কলকাতার আদিম বাসিন্দা। পল্লীগ্রামের কোনো স্পর্শ আমি প্রথম বয়সে পাই নি। এইজন্য যখন প্রথম আমাকে জমিদারির কাজে নিযুক্ত হতে হল তখন মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছিল, হয়তো আমি এ কাজ পারব না, হয়তো আমার কর্তব্য আমার কাছে অপ্রিয় হতে পারে। জমিদারির কাজকর্ম, হিসাবপত্র, খাজনা আদায়, জমা-ওয়াশিল— এতে কোনোকালেই অভ্যস্ত ছিলুম না ; তাই অজ্ঞতার বিভীষিকা আমার মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেই অঙ্ক ও সংখ্যার বাঁধনে জড়িয়ে পড়েও প্রকৃতিস্থ থাকতে পারব এ কথা তখন ভাবতে পারি নি।

“কিন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করলুম, কাজ তখন আমাকে পেয়ে বসল। আমার স্বভাব এই যে, যখন কোনো দায় গ্রহণ করি তখন তার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করে দিই, প্রাণপণে কর্তব্য সম্পন্ন করি, ফাঁকি দিতে পারি নে। এক সময়ে আমাকে মাস্টারি করতে হয়েছিল, তখন সেই কাজ সমস্ত মন দিয়ে করেছি, তাতে নিমগ্ন হয়েছি এবং তার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি। যখন আমি জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত তখন তার জটিলতা ভেদ করে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে চিন্তা করে যে-সকল রাস্তা বানিয়েছিলুম তাতে আমি খ্যাতিলাভ করেছিলুম। এমন-কি, পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা আমার কাছে তাঁদের কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন, কী প্রণালীতে আমি কাজ করি তাই জানবার জন্যে।

“আমি কোনোদিন পুরাতন বিধি মেনে চলি নি। এতে আমার পুরাতন কর্মচারীরা বিপদে পড়ল। তারা জমিদারির কাগজপত্র

এমনভাবে রাখত যা আমার পক্ষে দুর্গম। তারা আমাকে যা বুঝিয়ে দিত তাই বুঝতে হবে, এই তাদের মতলব। তাদের প্রণালী বদলে দিলে কাজের ধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়। তারা আমাকে বলত যে, যখন মামলা হবে তখন আদালতে নতুন ধারার কাগজপত্র গ্রহণ করবে না, সন্দেহের চোখে দেখবে। কিন্তু যেখানে কোনো বাধা সেখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, বাধা আমি মানতে চাই নে। আমি আদ্যোপান্ত পরিবর্তন করেছিলুম, তাতে ফলও হয়েছিল ভালো।

"প্রজারা আমাকে দর্শন করতে আসত, তাদের জন্য সর্বদাই আমার দ্বার ছিল অবারিত— সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক, তাদের কোনো মানা ছিল না। এক-এক সময় সমস্ত দিন তাদের দরবার নিয়ে দিন কেটে গেছে, খাবার সময় কখন অতীত হয়ে যেত টের পেতেম না। আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করেছি। যে-ব্যক্তি বালক কাল থেকে ঘরের কোণে কাটিয়েছে, তার কাছে গ্রামের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু কাজের দুরূহতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে, নূতন পথ নির্মাণের আনন্দ আমি লাভ করেছি।

"যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলেম, ততদিন তাকে তন্নতন্ন করে জানবার চেষ্টা আমার মনে ছিল। কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর-এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে, শিলাইদা থেকে পতিসর, নদী-নালা বিলের মধ্য দিয়ে— তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লী-বাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠত। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লুম পল্লীশ্রীর কোলে— মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম। ক্রমে এই পল্লীর দুঃখ-দৈন্য আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, তার জন্যে কিছু করব এই আকাঙ্ক্ষায় আমার মন ছটফট করে উঠেছিল। তখন আমি যে জমিদারি-ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক্‌বৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে

হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম— কী করলে এদের মনের উদ্‌বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে। আমরা যদি বাইরে থেকে সাহায্য করি তাতে এদের অনিষ্টই হবে। কী করলে এদের মধ্যে জীবন সঞ্চার হবে, এই প্রশ্নই তখন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এদের উপকার করা শক্ত, কারণ এরা নিজেকে বড়ো অশ্রদ্ধা করে। তারা বলত, 'আমরা কুকুর, কষে চাবুক মারলে তবে আমরা ঠিক থাকি।'…

"আমার শহুরে বুদ্ধি। আমি ভাবলুম এদের গ্রামের মাঝখানে ঘর বানিয়ে দেব ; এখানে দিনের কাজের পর তারা মিলবে ; খবরের কাগজ, রামায়ণ মহাভারত পড়া হবে ; তাদের একটা ক্লাবের মতো হবে। সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবতে আমার মন ব্যথিত হত ; সেই একঘেয়ে কীর্তনের একটি পদের পুনরাবৃত্তি করছে, এইমাত্র।

"ঘর বাঁধা হল, কিন্তু সেই ঘর ব্যবহার হল না। মাস্টার নিযুক্ত করলুম, কিন্তু নানা অজুহাতে ছাত্র জুটল না। তখন পাশের গ্রাম থেকে মুসলমানেরা আমার কাছে এসে বললে, 'ওরা যখন ইস্কুল নিচ্ছে না তখন আমাদের একজন পণ্ডিত দিন, আমরা তাকে রাখব, তার বেতন দেব, তাকে খেতে দেব।' এই মুসলমানদের গ্রামে যে পাঠশালা তখন স্থাপিত হয়েছিল তা সম্ভবত এখনো থেকে গিয়েছে। অন্য গ্রামে যা করতে চেয়েছিলুম তা কিছুই হয় নি। আমি দেখলুম যে. নিজের উপর নিজের আস্থা এরা হারিয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন, উপকার করব বললেই উপকার করা যায় না, তাই প্রকৃত জনকল্যাণমূলক কাজ করতে গিয়ে বাধা পেয়েছেন বিস্তর। বেদনাদায়ক অনেক দৃষ্টান্ত তাঁর ঝুলিতে ছিল। অন্য জমিদাররা দু হাতে টাকা বিলিয়ে কোনো দাবি হয় মঞ্জুর করেছেন, নয় 'না' বলে দিয়ে দায়িত্বক্ষালন করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার বিপরীত, তিনি প্রজাদের যুক্ত করতে চেয়েছিলেন সব ব্যাপারে। কিন্তু, তাতে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়িয়ে যায়। তিনি 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে বলছেন—

"আমার জমিদারিতে নদী বহুদূরে ছিল, জলকষ্টের অন্ত ছিল না। আমি প্রজাদের বললুম, 'তোরা কুয়ো খুঁড়ে দে, আমি বাঁধিয়ে দেব।' তারা বললে, 'এ যে মাছের তেলে মাছ ভাজবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা কুয়ো খুঁড়ে দিলে আপনি স্বর্গে গিয়ে জলদানের পুণ্যফল আদায় করবেন আমাদের পরিশ্রমে!' আমি বললুম, 'তবে আমি কিছুই দেব না।' এদের মনের ভাব এই যে, 'স্বর্গে এর জমাখরচের হিসাব রাখা হচ্ছে— ইনি পাবেন অনন্ত পুণ্য, ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোকে চলে যাবেন, আর আমরা সামান্য জল মাত্র পাব।'

"আর-একটি দৃষ্টান্ত দিই। আমাদের কাছারি থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত উঁচু করে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছিলুম। রাস্তার পাশে যে-সব গ্রাম তার লোকদের বললুম, 'রাস্তা রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমাদের।' তারা যেখানে রাস্তা পার হয় সেখানে গোরুর গাড়ির চাকায় রাস্তা ভেঙে যায়, বর্ষাকালে দুর্গম হয়। আমি বললুম, 'রাস্তায় যে খাদ হয় তার জন্যে তোমরাই দায়ী, তোমরা সকলে মিলে সহজেই ওখানটা ঠিক করে দিতে পার।' তারা জবাব দিলে, 'বাঃ, আমরা রাস্তা করে দেব, আর কুষ্টিয়া থেকে বাবুদের যাতায়াতের সুবিধা হবে!' অপরের কিছু সুবিধা হয় এ তাদের সহ্য হয় না। তার চেয়ে তারা নিজেরা কষ্টভোগ করে সেও ভালো। এদের ভালো করা বড়ো কঠিন··· যারা বহুযুগ থেকে এইরকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয়, তাদের উপকার করা বড়োই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ। তখনকার দিনে এই কাজে আমার একমাত্র সহায় ছিলেন কালীমোহন। তাঁর রোজ দু-বেলা জ্বর আসত। ঔষধের বাক্স খুলে আমি নিজেই তাঁর চিকিৎসা করতুম।"

১৯৩০ সালের রাশিয়ার চিঠিতেও বলছেন, "একদা আমি পদ্মার

চরে বোট বেঁধে সাহিত্যচর্চা করেছিলুম। মনে ধারণা ছিল, লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগ্যই নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে, আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হল— আচ্ছা আমিই এ কাজে লাগব।”

রবীন্দ্রনাথ যে-সব নূতন রীতি চালু করলেন, তার প্রায় সব কটিই নানা বিপত্তি সত্ত্বেও দীর্ঘদিন চলেছিল। ব্যর্থতা ছিল কয়েকটি অঞ্চলে, বিশেষ করে শিলাইদহে। কিন্তু সাফল্যও কম নয়। এই সাফল্যের রূপ, আগেই বলেছি, সর্বাধিক চোখে পড়ে রাজশাহীর কালীগ্রাম পরগনায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে রথীন্দ্রনাথ পতিসরে যান। তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে ‘পল্লীর উন্নতি’ নামক প্রবন্ধে।

“সেবার পতিসরে পৌঁছে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতি দেখে মন পুলকিত হয়ে উঠল। পতিসরের হাইস্কুলে ছাত্র আর ধরছে না দেখলুম— নৌকার পর নৌকা নাবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ছেলের দল ইস্কুলের ঘাটে। এমন-কি, আট-দশ মাইল দূরের গ্রাম থেকেও ছাত্র আসছে। পড়াশোনার ব্যবস্থা প্রথম শ্রেণীর কোনো ইস্কুলের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। পাঠশালা, মাইনর স্কুল সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তিনটি হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারির কাজ ভালো চলছে। মামলা-মকদ্দমা খুবই কম, যে অল্পস্বল্প বিবাদ উপস্থিত হয় তখনই প্রধানরা মিটিয়ে দেন। যে-সব জোলারা আগে কেবল গামছা বুনত তারা এখন ধুতি শাড়ি বিছানার চাদর বুনে আমাকে দেখাতে আনল। ঐ অঞ্চলে যত রকম মাছ ধরার জাল বা খাঁচা ব্যবহার করা হয় একটি জেলে তার এক সেট মডেল আমাকে উপহার দিল। কুমোরেরাও নানারকমের মাটির বাসন এনে দেখাল। গবর্নমেণ্টের নতুন আইনের সাহায্যে ঋণমুক্ত হয়ে গ্রামের লোকদের চিরন্তন আর্থিক দুরবস্থা

প্রজাগণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ

আর নেই। আমাকে চাষিরা কেবল অনুযোগ জানাল, 'বাবুমশায়, আমাদের আরো ট্র্যাক্টর এনে দিলেন না?' ১৩১৫ সালে বাবা লিখেছিলেন তাঁর এক চিঠিতে— 'যাতে গ্রামের লোকে নিজেদের হিতসাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে— পথঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায়, ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়— তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে।'— তাঁর দীর্ঘকালের সেই চেষ্টা যে এমন সুফল দিয়েছে তা দেখে আনন্দে আমার মন ভরে গেল।"

আর রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর কাজের ফল সম্পর্কে অবহিত। কিঞ্চিৎ বেদনা নিয়ে ১৯৩৪ সালে তিনি বলেন, "য়ুরোপের মতো আমাদের জনসমূহ নাগরিক নয়— চিরদিনই চীনের মতো ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে ইংরেজ আমাদের সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ঐ নীচের দিক দিয়ে। সেখানে কী অভাব, কী দুঃখ, কী অন্ধতা, কী শোচনীয় নিঃসহায়তা— বলে শেষ করা যায় না। এই-খানেই পুনর্বার প্রাণসঞ্চার করবার সামান্য আয়োজন করেছি— না পেয়েছি দেশের লোকের কাছ থেকে উৎসাহ, না পেয়েছি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সহায়তা। তবু আঁকড়ে ধরে আছি। দেশকে কোন্ দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর আমার— ঐ গ্রামের কাজে। এতদিন পরে মহাত্মাজি হঠাৎ এই কাজে পা বাড়িয়েছেন। তিনি মহাকায় মানুষ, তাঁর পদক্ষেপ খুব সুদীর্ঘ। তবু মনে হয় অনেক সুযোগ পেরিয়ে গেছেন, অনেক আগে শুরু করা উচিত ছিল— এ কথা আমি বারবার বলেছি। আজ তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। স্পষ্ট না বলুন, এর অর্থ এই যে, কংগ্রেস জাতিসংগঠনের মূলে হাত দিতে অক্ষম। যেখানে কাজের সমবায়তা স্বল্প সেখানে নানা মেজাজের মানুষ মিললে

অনতিবিলম্বে মাথা ঠোকাঠুকি করে মরে। তার লক্ষণ নিদারুণ হয়ে উঠেছে। এই সম্মিলিত আত্মকলহের ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী কাজ কেউ করতে পারে না। আমার অল্প শক্তিতে আমি বেশি কিছু করতে পারি নি। কিন্তু এই কথা মনে রেখো, পাবনা কনফারেন্স থেকে আমি বরাবর এই নীতিই প্রচার করে এসেছি। আর, শিক্ষা-সংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ। এর সংকল্পের মূল্য আছে— ফলের কথা আজ কে বিচার করবে?"

অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ কল্পনাবিহারী কবি, ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করেন, কিন্তু তাঁরা জেনেশুনে সব ভুলে থাকেন। তাঁরা জানেন না যে, একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বলতে পারেন, 'এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে।'

তবে গ্রামের উন্নতি চাইলেও রবীন্দ্রনাথ কখনো চান নি গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। তিনি বলেন, "গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত— বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ সে-পরিমাণে ব্যাপক হয় নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।"

অনেকে বলেন, সবই তো বুঝলুম, কিন্তু সাহিত্যে তার প্রতিফলন কোথায়? যাঁরা এই প্রশ্ন করেন, ধরে নিতে হবে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কোনো বই পড়েন নি। গোরা মুক্তধারা কালের যাত্রা ইত্যাদি তো নয়ই। পড়লে স্বচ্ছচিন্তার ক্ষেত্রে এ দেশে এত দুর্দশা হত না এবং এত রবীন্দ্র-বিদ্বেষও থাকত না। আবার অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তাধারা পেলেন কোন্ বই পড়ে, কার কাছ থেকে? আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথ নিজে যেন এ-সব ভাবতেও পারেন না!

১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কর্মযজ্ঞকে দ্বিখণ্ডিত করে একভাগ নিয়ে এলেন শ্রীনিকেতনে, অন্যভাগ রইল তাঁর নিজস্ব জমিদারি পতিসরে। এই দ্বিখণ্ডীকরণের প্রধান কারণ অবশ্য মণ্ডলীপ্রথার ব্যর্থতা। আমলারা এতই ক্ষমতাশালী, তাদের কূটবুদ্ধি এতই প্রখর এবং সম্পন্ন প্রজাদের সঙ্গে কায়েমী স্বার্থের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, মণ্ডলীপ্রথা বেশিদিন টিঁকতে পারে নি। কিন্তু তাঁর মনে সব সময় উজ্জ্বল হয়ে ছিল— শিলাইদহ-পতিসর।

শ্রীনিকেতনে তাঁর কর্মযজ্ঞ প্রসারিত করার কয়েক বছর পর ১৯২৮ সালে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে তিনি যে চিঠি লেখেন, তাতেও সেই জমিদারির কথা উল্লেখ করেছেন, বলেছেন, "আমার সেই সময়কার অজ্ঞাতবাসের কথা কেহই ঠিকমত জানিবে না। তখন আমি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত ছিলাম বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। আজ আমি জনতার মধ্যে নিরাশ্রয়— আমার বাসা ভাঙিয়াছে।"

এই আক্ষেপের কথা তিনি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে জানান। বলেন, "আমার পক্ষে এ বিচ্ছেদটি সামান্য নয়— যেন অলকাপুরীতে ঐশ্বর্য সবই আছে কেবল স্বয়ং লক্ষ্মীই নেই।" তাই শান্তিনিকেতনে বানপ্রস্থ নিয়েও শিলাইদহ-পতিসরকে মন থেকে তিনি সরিয়ে নিতে পারেন নি, বারবার গিয়েছেন, সেখানকার উন্নয়নে সর্বস্ব পণ করেছেন, যদিও তিনি জীবনের শেষ দিকে আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, "সম্মানের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত, সে পরিবেষ্টন আর ভেদ করতে পারব না।"

একদিকে বিশ্বের আহ্বান, অন্য দিকে গ্রামলক্ষ্মীর ডাক। একদিকে বীরভূমের বিশ্বভারতী, অন্য দিকে রাজশাহী-নদীয়ার জমিদারি— এই দুইয়ের টানাপোড়েনে কেটেছে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবন। আগেই বলেছি, তিনি শিলাইদহে শেষ যান ১৯২২ সালে, সে বছরই শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা। পতিসরে তাঁর শেষ যাত্রা ১৯৩৭ সালে,

যখন বয়স ছিয়াত্তর। ত্রিশ বছর বয়সে ১৮৯১ সালে প্রথম যখন জমিদারিতে যান, তখন যেমন উপলক্ষ ছিল পুণ্যাহ, তেমনি এই শেষ যাত্রাও পুণ্যাহ উপলক্ষে।

শিলাইদহে শেষযাত্রায় কবির সঙ্গী ছিলেন সি. এফ. এণ্ডরুজ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গ্রামবাসীরা কবিকে সেবার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা জানান। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বহু প্রজা। চৌদ্দ-পনেরো মাইল দূর থেকে ওঁরা আসেন বাবুমশাইকে নজরানা দিতে। স্থানীয় মুসলমান মহিলারা রবীন্দ্রনাথকে একটি কাঁথা উপহার দেন। সেটি এখনো আছে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে। সেবার কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে যে মানপত্র দেওয়া হয়, তা পাঠ করেন স্থানীয় মাইনর স্কুলের এক শিক্ষক। মানপত্রের রচয়িতা শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী। "জগৎপূজ্য কবিসম্রাট শ্রীল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়" সম্পর্কে বলা হয়— "এসো গো হৃদয়রাজ, এসো ঋষি, বাণীর অমর পুত্র, হে কবিসম্রাট ; তীর্থ এ শিলাইদহ, ভক্ত প্রাণে আজি একি আনন্দ বিরাট!"

শিলাইদহ কাছারির পক্ষ থেকে আবেদনপত্র পেশ করা হয়। রচনা করেন পেশকার শরৎ সরকার। পাঠ করেন হেড মুনসি বিজয়-ভূষণ রায়। কাছারির কর্মচারীরা রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঁচ দফা আবেদন করেন। মোদ্দা কথাটা হল 'জমিদার, কর্মচারী ও প্রজা-সাধারণ যাহাতে সকলেই সকলকে বুঝিয়া উঠিতে পারে, যাহাতে তিনটি সম্প্রদায়ই একসূত্রে বদ্ধ থাকিয়া একমনে সকলেই দেশের কাজ করে এইরূপ উপদেশ প্রার্থনা।'

শিলাইদহের প্রজাবৃন্দের পক্ষে আবেদনপত্রে প্রার্থনা জানান "একান্ত অনুগত ক্ষুদ্র প্রজা শ্রীজেহেরালী বিশ্বাস সাং চর কালোয়া।" তিনি বলেন, 'আজ আমাদের কি আনন্দের দিন··· সমস্ত প্রকৃতি যেন আজ শতবেণুরবে গাইছে— ধন্য হয়েছি মোরা তব আগমনে।'

বিরাট এই প্রার্থনাপত্রের শেষ দিকে বলা হয়— "সমুদ্রমন্থন

করিয়া একদিন দেবতারা অমৃত তুলিয়া অমর হইয়াছেন। আমরাও আজ আপনার জ্ঞানরূপ সমুদ্র ছেঁচিয়া তার মাঝখান থেকে অমৃতবাণী তুলিয়া মর্মে মর্মে গাঁথিয়া জীবনের কর্তব্যপথে অগ্রসর হব। কিন্তু শত পরিতাপের বিষয়, আমরা বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন; সে অমৃত তুলিতে আমাদের উপযুক্ত আসবাবের অভাব। তবে আজ আপনার ন্যায় একজন নায়কের শুভাগমনে যে আনন্দটুকু পেয়েছি, তার যতটুকু সাধ্য সাজাইয়া গুছাইয়া এই ক্ষুদ্র ঝুলিটি পূর্ণ করিয়া এই সোনার হাটের মধ্যে আনিয়া দিলাম, আপনার সুধামুখের সুধাবর্ষণ প্রার্থনা করিতে :

১. গৃহস্থেরা সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাঠে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, তবু তাহাদিগকে দুমুঠো ভাতের জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হয়। কিরূপে তাদের এই দুরবস্থা দূর হইতে পারে এই সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

২. দেশ থেকে হাজার হাজার মণ শস্য সস্তা দরে বিদেশে চলিয়া যাচ্ছে, আর বিদেশ থেকে যা আসছে তা তাহাদিগকে অতিরিক্ত মূল্যে কিনিতে হচ্ছে। তার প্রতিকারের উপায় কি, এ সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

৩. বর্তমানে দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেকের কি কি করা কর্তব্য এ সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

৪. দেশের গরিবের ছেলে উপযুক্ত লেখাপড়া শিখে সহায় অভাবে জীবনে উন্নতির দিকে যাইতে পারে না জন্য ক্রমে ক্রমে অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কি করা কর্তব্য এ সভায় তাহার সৎ উপদেশ প্রার্থনা করে।

অতএব প্রার্থনা, অধীনগণের এই ক্ষুদ্র এ আকিঞ্চন গ্রহণ করিলে জীবনে ধন্য হইব। নিবেদন ইতি। ১৩২৮। ২১ চৈত্র।"

রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের কী উপদেশ দিয়েছিলেন তা জানতে পারি নি। কিন্তু এটুকু জানি সেই শেষ যাত্রা হলেও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শিলাইদহ তাঁর হৃদয়ের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল। শিলাইদহে

তবু আর যান নি কেন? ১৯৩৮ সালে জনৈক শিলাইদহবাসীর কাছে এক চিঠিতে তিনি লেখেন: "অনেকবার শিলাইদহ দর্শন করে আসবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই আমার চিরপরিচিত শিলাইদহ এখন আর সেদিনকার সেই আনন্দ রূপে প্রতিষ্ঠিত নেই নিশ্চয় জেনে নিরস্ত হয়েছি।"

শিলাইদহে শেষ যাত্রার বারো বছর পর পতিসরে তাঁর শেষ যাত্রা। সেটাই তখন তাঁর একমাত্র নিজস্ব জমিদারি। সেবার তিনি বোটে ছিলেন। তখন ম্যানেজার বীরেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী। সেখানকার শতকরা ৮০জন প্রজাই মুসলমান ও চাষী।

কবির সঙ্গে ছিলেন একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, অবসর-প্রাপ্ত ম্যানেজার ও শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ও ভৃত্য বনমালী। রাজশাহীতে তখন জেলাশাসক ছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনিও এসেছিলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে।

পুণ্যাহসভার পর অভিনন্দন। প্রজাদের আনন্দের শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথও খুশি। তিনি বললেন, "সংসার থেকে বিদায় নেবার আগে তোমাদের দেখে যাব— আমার সেই আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হল। তোমরা এগিয়ে চল।"

বিকালে কাছারিতে সম্বর্ধনাসভায় রবীন্দ্রনাথ বোট থেকে পালকিতে এলেন। "কালীগ্রাম পরগণার রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের পক্ষে মোঃ কফিলুদ্দিন আকন্দ রাতোয়াল" সেই সভায় "মহামান্য দেশবরেণ্য দেবতুল্য জমিদার শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের পরগণায় শুভাগমন উপলক্ষে" শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন এই বলে—

"প্রভুরূপে হেথা আস নাই তুমি/দেবরূপে এসে দিলে দেখা/ দেবতার দান অক্ষয় হউক্/হৃদিপটে থাক্ স্মৃতিরেখা।"

রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তরে বলেন, "সংসার থেকে বিদায় নেবার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা হল— এইটিই আমার সান্ত্বনা। তোমাদের কাছে অনেক পেয়েছি— কিন্তু কিছু দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

সে-সব কথা মনে হলে বড় দুঃখ পাই। কিন্তু আর সময় নেই, আমার যাবার সময় হয়েছে, শরীর আমার অসুস্থ— এ অবস্থায় তোমাদের মধ্যে এসে, তোমাদের সঙ্গে থেকে তোমাদের উন্নতির জন্য কিছু করবার ইচ্ছা থাক্‌লেও, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও, তোমাদের সবার মঙ্গল হোক— তোমাদের সবাইকে এই আশীর্বাদই আমার শেষ আশীর্বাদ।"

কবির কথা শুনে প্রজাদের চোখ ছলছল। একজন বৃদ্ধ মুসলমান প্রজা রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করে বললেন, "আমরা তো হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরাও চলতি পথে; বড়ই দুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়।"

রবীন্দ্রনাথও বিচলিত। বললেন, "তোমরা আমার বড়ো আপন জন, তোমরা সুখে থাকো।"

বিরাট জনতা নীরব। খানিক থেমে রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন, "তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারি নি। ইচ্ছা ছিল মান সম্মান সম্ভ্রম সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের মতই সহজ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেব। কী করে বাঁচতে হবে তোমাদের সঙ্গে মিলে সেই সাধনা করব, কিন্তু আমার এই বয়সে তা হবার নয়, আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। এই নিয়ে দুঃখ করে কী করব? তোমাদের সবার উন্নতি হোক— এই কামনা নিয়ে আমি পরলোকে চলে যাব।"—

কবির সঙ্গী-সচিব সুধাকান্ত রায়চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলছেন: "অতীতের পুরানো কথা বলতে বলতে কবি এবং প্রজাদের চোখ ছল-ছল করে উঠেছে আনন্দের অশ্রুবাষ্পে। এ দৃশ্য দেখতে পাব কোনো-দিন ভাবতে পারি নি।... সাম্প্রদায়িক এই দুর্দিনে পতিসরে মুসলমান-বহুল প্রজামণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায় সেটা চোখে যাঁরা দেখেছেন, তারা যতটা বুঝবেন— চোখে যাঁরা দেখেন নি, তাঁদের সে কথা লিখে বুঝিয়ে বলা শক্ত।"

ওদিকেও বিদায় নেবার সময় হয়েছে। বোট প্রস্তুত। কবিকে নিয়ে বোট ছাড়ল পতিসর কাছারির ঘাট থেকে। নাগর ও আত্রাই নদী তিনি পেরোলেন। নদীর দুধারে প্রজাদের সারি। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছে, পেরিয়ে যাচ্ছে তাঁর পরিচিত জনপদ, প্রত্যেকটিতে যেন তাঁরই লেখা সেই অসামান্য গল্পটির মতো সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি স্থির, ভঙ্গি নিরাসক্ত। উন্নতদর্শন দীর্ঘ চেহারা ঈষৎ ন্যুব্জ। শেষ নমস্কার তিনি জানালেন করজোড়ে।

সাদাচুল ও দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে, উড়তে চাইছে বাদামী জোব্বা। ওদিকে পালেও লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া। রবীন্দ্রনাথ বোটের ভিতরে চলে এলেন, এলেন স্মৃতিভারে উদ্‌বেল মন নিয়ে। সেখানেও জানালা দিয়ে শেষ দেখা দেখতে লাগলেন কৈশোর থেকে বার্ধক্য—দীর্ঘদিনের সঙ্গী তাঁর প্রিয় মানুষ আর প্রিয় প্রকৃতিকে। ওদিকে—

"নৌকা ছাড়িয়া দিল। বর্ষা-বিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারি দিকে ছল ছল করিতে লাগিল। তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি,' কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে— এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।"

—

ব্যক্তিপরিচিতি

নামের পাশে গ্রন্থে প্রথম উল্লেখিত পৃষ্ঠাসংখ্যা

নাম	পরিচিতি
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ২৮	ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ
অতুল সেন ৩৭	দেশকর্মী, গ্রামোন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী
অন্নদাশঙ্কর রায় ৮৬	লেখক, একদা জেলাশাসক
অবনীন্দ্রনাথ ৭	শিল্পী, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠপুত্র ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র
অমলা দাশ ২৬	চিত্তরঞ্জন দাশের ভগ্নি, কবি-পত্নীর সখী ও বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত গায়িকা
অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী ৮৩	কবি ও রবীন্দ্রনাথের একদা-একান্ত-সচিব
ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী ১০	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী
ইসমাইল মোল্লা ৪৬	ঠাকুর এস্টেটের প্রজা
উজির ৬৮	কবির বরকন্দাজ
এণ্ডরুজ ৩৪	সি. এফ. এণ্ডরুজ— দীনবন্ধু, ভারতবন্ধু ইংরেজ, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সহকর্মী
এডওয়ার্ড ৬৫	ঠাকুর এস্টেটের সাহেব-ম্যানেজার
এলমহার্স্ট ৩৮	গ্রামোন্নয়নে কবির ইংরেজ সহকর্মী
ও-ম্যালে ৪৪	রাজশাহীর তৎকালীন জেলা-শাসক

বিপিনবিহারী বিশ্বাস ৬৫	ঠাকুর এস্টেটের কর্মী
বিশ্বনাথ ২	শিলাইদহ অঞ্চলের কর্মী
বীরেন্দ্রনাথ ১২	রবীন্দ্রনাথের ন' দাদা
বীরেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী ৮৬	পতিসরের ম্যানেজার
বুধেন্দ্রনাথ ১২	রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
বেলা ৩৫	রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা
বৈষ্ণবচরণ শেঠ ৭	জোড়াসাঁকো অঞ্চলের ব্যবসায়ী
ভূপেশ রায় ৬৬	ঠাকুর এস্টেটের কর্মী
মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ৪৭	কাশিমবাজারের মহারাজা
মনোরঞ্জন চৌধুরী ৬৪	শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র
মহর্ষি ৯	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহিম ঠাকুর ৩৪	ত্রিপুরা রাজবাড়ির সন্তান, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু
মহিম সরকার ৭৩	ঠাকুর এস্টেটের কর্মী
মীরা ৩৫	রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা
মুকুল দে ৩৪	শিল্পী
মৃণালিনী দেবী ৩৬	রবীন্দ্রনাথের পত্নী
মেছের সর্দার ৩৬	বরকন্দাজ
মৈজদ্দিমোল্লা ৭৩	ঠাকুর এস্টেটের কর্মী
যতীন্দ্রনাথ বসু ৩৩	রবীন্দ্রনাথের বন্ধু
যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ১১	দেবেন্দ্রনাথের জামাতা, শরৎকুমারী দেবীর স্বামী
যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় ৪৭	শীতলাইয়ের জমিদার
রথীন্দ্রনাথ ১৬	রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র
রতিকান্ত দাস ৬৬	ঠাকুর এস্টেটের নায়েব

সত্যেন্দ্রনাথ ১১	রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা
সত্যেশ্বর নাগ ৭৪	গ্রামোন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী
সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ৩৬	কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পুত্র, শান্তিনিকেতনের শিক্ষক
সমরেন্দ্রনাথ ১৫	গুণেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র
সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ১২	রবীন্দ্রনাথের বড়ো ভগ্নিপতি
সাহানা দেবী ১২	বলেন্দ্রনাথের স্ত্রী
সুকুমারী দেবী ১২	রবীন্দ্রনাথের দিদি
সুরেন কর ৩৫	শিল্পী, শান্তিনিকেতনের কর্মী
সুরেন্দ্রনাথ ১৫	সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ১৮	রাষ্ট্রগুরু, দেশনায়ক
সোমেন্দ্রনাথ ১২	রবীন্দ্রনাথের দাদা
সৌদামিনী দেবী ১২	রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি
স্বর্ণকুমারী দেবী ১২	রবীন্দ্রনাথের ন'দিদি
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫	ঠাকুর এস্টেটের কর্মী ও শান্তিনিকেতনের শিক্ষক
হরিনাথ মজুমদার ১৩	কাঙাল হরিনাথ নামে পরিচিত কর্মী, লেখক ও সংগীতজ্ঞ
হেমেন্দ্রনাথ ১১	রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা

পৃ ১০ ছত্র ১৯ শব্দ ৭ 'গণেন্দ্রনাথের' স্থলে হবে 'গুণেন্দ্রনাথের'